মধ্যযুগের ইতিহাস

ARUNIK

Approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book on **History** for Class VII.
(Vide T. B/VII/H/81/44 dated 8. 1. 81)

মধ্যযুগের ইতিহাস

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক আশিস বরণ মাইতি
এম. এ., বি. এড্, এল-এল. বি
ইতিহাস বিভাগ
চিত্তরঞ্জন কলেজ, কলিকাতা

পরিমার্জিত (১৯৮৩) সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান :

জাতীয় প্রকাশক • প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৪/২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগ

প্রথম পাঠ

ইউরোপের রোমান সাম্রাজ্যের পতন—নূতন ধরনের রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা ও অর্থনীতির সূচনা ঃ

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে নবজাগরণের যুগ পর্যন্ত যে সময়, তাকে সাধারণভাবে ইতিহাসে মধ্যযুগ বলা হয়। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যযুগের শুরু, আর প্রায় ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যযুগের শেষ। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রাচীনকালের সভ্যতা ধীরে ধীরে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক কালের সভ্যতায় পরিণত হয়। তবে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে মধ্যযুগের গভীর সম্পর্ক থাকলেও, এই সময় প্রাচীন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে সেই সব দেশেও প্রাচীন যুগের অবসান এবং মধ্যযুগের সূত্রপাত ঘটে। মধ্যযুগের ইতিহাসে আর একটি বিষয়ও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন যুগের সভ্য জাতিগুলো ছাড়াও কোন কোন অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত কম উন্নত জাতির লোকেরা মধ্যযুগের ইতিহাস ও সভ্যতা গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের কালে রোমের সভ্যতার অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সভ্যতার ক্ষেত্রে নতুন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতাও রোমের অধিবাসীরা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে। পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের উপর জার্মান উপজাতিদের অধিকার স্থাপিত হওয়ার ফলে, রোমের সভ্যতার সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। প্রাচীন সভ্যতা রক্ষা করার পরিবর্তে নূতন কিছু সৃষ্টি করার দিকে তারা বেশি মনোযোগ দেয়। কিন্তু রোমের শিল্প, সাহিত্য ও শাসন-ব্যবস্থার প্রতি তাদের

যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। রোম সাম্রাজ্য জয়ের পর তারা প্রথম দিকে নিষ্ঠুর-ভাবে রোম সভ্যতা ধ্বংস করলেও, পরবর্তীকালে তারা রোমের সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে রোম এবং জার্মানীর উপজাতিদের সভ্যতার মিলনের ফলে ইউরোপের রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানারূপ পরিবর্তন দেখা দেয়।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ইউরোপের রাজনৈতিক জগতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। বিশাল রোমান সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সব অঞ্চলে নূতন নূতন রাজ্য গড়ে উঠতে শুরু করে। বিশেষতঃ বর্বর উপজাতি রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করার সুযোগ লাভ করে এবং পুরানো দিনের শাসকদের বিতাড়িত ক'রে সেই সব অঞ্চলে নিজেদের জন্য নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে।

রাজনৈতিক জগতে এরূপ পরিবর্তনের ফলে ইউরোপের সমাজ, শিক্ষা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও নানারকম পরিবর্তন দেখা দেয়। পুরানো দিনের সামাজিক আইন-কানুন পরিবর্তিত হয় এবং প্রায় সমগ্র ইউরোপেই সামন্ত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন সমাজ গড়ে ওঠে।

পুরানো দিনের বর্বর জাতির আক্রমণের ফলে প্রাচীনকালের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে বেশ কিছুদিনের জন্য ইউরোপের শিক্ষা জগতে অন্ধকার যুগ নেমে আসে। কিন্তু পরে খ্রীষ্টান যাজক ও খ্রীষ্টান মঠগুলোর প্রচেষ্টায় আবার নূতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। এই সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই ইউরোপের মধ্যযুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

মধ্যযুগের ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নানারূপ পরিবর্তন ঘটে। নূতন রাস্তাঘাট -নির্মাণের ফলে বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বিশেষতঃ ধর্মযুদ্ধের সময় ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য খুব সমৃদ্ধি লাভ করে এবং এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ইউরোপের অনেক অঞ্চলে নূতন নূতন শহর ও বন্দর গড়ে উঠতে শুরু করে।

দ্বিতীয় পাঠ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ও তার পরবর্তী যুগ

হূণজাতির আক্রমণের ফলেই পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। ভারতবর্ষের গুপ্ত রাজবংশের পতনেরও অন্যতম কারণ হূণ জাতির আক্রমণ। ৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত রাজবংশের শেষ শক্তিশালী সম্রাট স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর হূণজাতি পাঞ্জাব ও পূর্ব-মালবে স্থায়িভাবে অধিকার স্থাপন করে। হূণদের আক্রমণে অন্যান্য অঞ্চলের গুপ্ত সাম্রাজ্যও বিপন্ন হয়ে পড়ে। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ ও কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার ফলে গুপ্তসাম্রাজ্য ধীরে ধীরে অনেকগুলো ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। এই সব রাজ্যে সাধারণভাবে গুপ্ত রাজবংশের আমলের প্রাদেশিক শাসনকর্তারা অথবা গুপ্তদের সামন্তরা নিজেদের অধিকার স্থাপন করে। গুপ্তদের রাজত্বকালে পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দেই ভারতবর্ষে ইউরোপের মত সামন্ত প্রথা প্রচলিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে সামন্ত প্রথা ভারতবর্ষে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই যুগে ভারতের বিভিন্ন স্থানের রাজবংশগুলোর মধ্যে মগধের 'পরবর্তী গুপ্তরাজবংশ', উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা ও আগ্রার মৌখরী রাজবংশ, মালবের রাজা যশোবর্মণ, সৌরাষ্ট্রের বল্লভী রাজবংশ, থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজবংশ, বেরারের বোকাটক রাজবংশ এবং বাংলাদেশের রাজা শশাঙ্কের নাম সুপরিচিত। এইসব রাজাদের ও রাজবংশের মধ্যে প্রায় সবগুলোই কোন-না-কোন ভাবে গুপ্তরাজবংশের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

Sp. mistake

তৃতীয় পাঠ

মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য

পূর্ব ও পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য, ভারত এবং প্রাচীনকালের অন্যান্য সভ্যদেশে মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্যযুগের সূচনা হয় এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই যুগের অবসান হয়। তবে সব দেশ সম্পর্কে এই মতামত সত্য নয়। কোন কোন অঞ্চলে

মধ্যযুগ আরও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়; বিশেষতঃ কোনরূপ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রাচীন ও আধুনিক যুগ থেকে মধ্যযুগকে ভাগ করা হয়নি। তাছাড়া মানবজাতির ইতিহাসকে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক তিনটি যুগ—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করা সম্ভব নয়। প্রাচীন-যুগের অনেক রীতিনীতিই মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল। এমনকি আধুনিক যুগেও প্রাচীন যুগের অনেক রীতিনীতি প্রচলিত রয়েছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের আচার-ব্যাবহার, রীতিনীতিরও পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতির প্রয়োজনে এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। মানুষের প্রয়োজনেই প্রাচীন যুগের অনেক রীতিনীতি মধ্যযুগে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এই সব রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবে নতুন রূপ গ্রহণ করেনি। মানব জাতির ইতিহাস মানুষের জীবনের মতো। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু পরিবর্তিত হলেও, সবকিছু পরিবর্তিত হয়নি। শক্তিশালী সামন্ত প্রথা, কৃষির ক্ষেত্রে খামার প্রথা, জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের সূচনা, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘর্ষ, নূতন নূতন শহরের পত্তন ও শিল্পের প্রবর্তন মধ্যযুগেই প্রথম দেখা যায়। শিক্ষার প্রসার, প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ, শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন—এই যুগের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তবে মধ্যযুগের ইতিহাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালের সভ্য দেশগুলোর সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু মধ্যযুগের সভ্যতার মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তাদের সভ্যতা, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

অনুশীলনী

১। রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি? রোম সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ইউরোপে কি পরিবর্তন দেখা যায়?

২। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য কি ভাবে গড়ে ওঠে?

৩। জার্মান উপজাতিরা কি ভাবে রোম সাম্রাজ্যের উপর অধিকার স্থাপন করে? রোম সাম্রাজ্যের উপর তাদের অধিকার স্থাপনের ফলে কি কি পরিবর্তন দেখা যায়?

৪। ভারতবর্ষের গুপ্ত সাম্রাজ্য কি ভাবে ধ্বংস হয়? গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

৫। মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল?

(খ) পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল?

(গ) জার্মান উপজাতির কোন্ নেতা রোম জয় করেন?

(ঘ) গুপ্তবংশের শেষ শক্তিশালী রাজার নাম কি?

(ঙ) কাদের আক্রমণে ইউরোপের রোম সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষের গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?

৭। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(ক) — খ্রীষ্টাব্দে মধ্যযুগে শুরু আর — খ্রীষ্টাব্দে মধ্যযুগের শেষ।

(খ) পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য — সাম্রাজ্যে নামেও পরিচিত।

(গ) গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনেরও অন্যতম কারণ — আক্রমণ।

(ঘ) — গুপ্তবংশের শেষ শক্তিশালী সম্রাট — মৃত্যু হয়।

(ঙ) সম্রাট— মৃত্যুর পর রোম সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউরোপের মধ্যযুগ

প্রথম পাঠ

জার্মান উপজাতিদের উপর হূণ জাতির আক্রমণ

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে মধ্য-এশিয়ার স্টেপ অঞ্চলের যাযাবর হূণজাতি দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের সমৃদ্ধ রাজ্যগুলোর উপর আক্রমণ শুরু করে। ৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে ককেশাস পর্বতের উত্তর দিকের কৃষ্ণসাগর ও নীপার নদীর মাঝামাঝি অঞ্চলের এই সময় অস্ট্রোগথ বা পূর্বগথ নামে একটি উপজাতি বাস করত। ৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে হূণ জাতির একটি দল ককেশাস পর্বত পেরিয়ে পূর্বগথদের রাজ্য আক্রমণ করে। কিছুদিনের মধ্যেই হূণজাতি আরও পশ্চিমদিকে এগিয়ে গিয়ে আর একটি জার্মান

উপজাতি পশ্চিমগথদের রাজ্যে উপস্থিত হয়। হূণদের আক্রমণে গথ জাতির তুটি শাখা, অস্ট্রোগথ বা পূর্বগথ ও ভিসিগথ বা পশ্চিমগথ উপজাতির লোকেরা, দানিয়ুব নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর এই তুটি জার্মান উপজাতিই নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। ৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম-সম্রাট ভ্যালেন্‌স্ পশ্চিমগথদের রোম সাম্রাজ্যে স্থায়িভাবে বসবাস করার অনুমতি দেন। এই অনুমতি পাওয়ার পরে দলে দলে জার্মান উপজাতি রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। কিন্তু রোমের সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এই সব জার্মান উপজাতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে রোম সম্রাট ভ্যালেন্‌স্ গথদের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধের পর জার্মান উপজাতিরা সুখে-শান্তিতে বর্তমান বুলগেরিয়া অঞ্চলে বাস করার সুযোগ লাভ করে। অন্যান্য উপজাতিরা সোপন, গলদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করতে শুরু করে। জার্মান উপজাতির সেনাবাহিনীকে রোমের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তবে বিভিন্ন জার্মান উপজাতি তাদের দলপতিদের নির্দেশই মেনে চলত। এই সব দল-পতিদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল ভিসিগথ বা পশ্চিমগথদের নেতা অ্যালারিক।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের উপর জার্মানদের কর্তৃত্ব

গথদের পর ভ্যাণ্ডাল, আলেমান্নি, বার্গাণ্ডিয়ান, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন জার্মান উপজাতির লোকেরা রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে শুরু করে। তাদের আক্রমণে বিব্রত হয়ে রোম সম্রাট হনোরিয়াস ৪০২ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পরিবর্তে র‍্যাভেনা শহরে রোম সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এখানে রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর অ্যালারিক পর পর তু'বার রোম নগরী আক্রমণ করে এবং রোমের

অধিবাসীদের কাছ থেকে প্রচুর ধন-সম্পত্তি জোর করে আদায় করেন।

৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমের সম্রাট হনোরিয়াসের মৃত্যু হয়। হনোরিয়াসের পরবর্তী রোম সম্রাটদের দুর্বলতার ফলে জার্মান উপজাতিরা তাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার সুযোগ লাভ করে। রোম সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে বিদেশী উপজাতিদের কর্তৃত্ব ক্রমেই বেড়ে চলে। ৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হূণ নেতা অ্যাটিলার অন্যতম সেনাপতি অরেস্টস রোম সম্রাট জুলিয়াস নেপোসকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে তাঁর ছেলে রোমুলাস অগাস্টুলাসকে সিংহাসন দান করেন। কিন্তু এরূপ রাজনৈতিক পরিবর্তনে জার্মান উপজাতিরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। নতুন সম্রাটের কাছে তারা অনেক দাবি-দাওয়া পেশ করে। রোম সম্রাট তাদের এই সব দাবি মানতে অস্বীকার করেন। ফলে জার্মান উপজাতিদের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা অডোয়াসার রোমুলাস অগাস্টু-লাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অডোয়াসার রোমুলাস অগাস্টুলাসকে পরাজিত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন এবং পশ্চিম-রোম সম্রাটের সিংহাসন অধিকার করেন। পূর্ব-রোমসাম্রাজ্যের সম্রাট অডোয়াসরের এই আধিপত্য অতি সহজভাবেই মেনে নিতে বাধ্য হন। ৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অডোয়াসারকে হত্যা করে থিয়োডোরিক নামে জার্মান উপজাতির আর একজন নেতা পশ্চিম-রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন। শাসক হিসাবে থিয়োডোরিক ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তাঁর আমলে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র জার্মান উপজাতিদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

রোমের আইন ও রোমের সম্রাটের গুরুত্ব

জার্মান উপজাতিরা পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য অধিকার করার পর দেশের শাসন পদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন করে। তবে রোমের আইন জার্মান আইনকানুনের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। সেজন্য রোমের প্রচলিত আইনের তারা কোন পরিবর্তন করেন নি। কিন্তু

জার্মান উপজাতিদের কাছে ধর্মের সঙ্গে আইনের এক গভীর সম্পর্ক ছিল। সুতরাং প্রয়োজন অনুসারে ধর্মের জন্য তারা আইনের কোন কোন অংশ রদলবদল করতে বাধ্য হয়।

নানা জাতি ও অনেক দেশ নিয়ে রোম সাম্রাজ্য গঠিত। সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক ব্যাপারে তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কিন্তু রোমের সম্রাট ছিলেন নানা জাতি ও বিভিন্ন দেশ নিয়ে গঠিত বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ও জনসাধারণের মধ্যে একতা গড়ে ওঠার প্রধান উৎস। প্রকৃতপক্ষে সম্রাটকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়। রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীরা সম্রাটের এই গুরুত্ব স্বীকার করত। জার্মান উপজাতিরাও প্রাচীনকালের নীতি অনুকরণ ক'রে, রোমের সম্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধি ক'রে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের ও নানা উপজাতির মধ্যে ঐক্য আনার চেষ্টা করে। রোম সাম্রাজ্যের উপর জার্মান উপজাতিদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার পরেও রোম সম্রাটের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র খর্ব হয় নি।

দ্বিতীয় পাঠ

অ্যালারিক, অ্যাটিলা ও গ্যাসেরিক

অ্যালারিক : অ্যালারিক জার্মান উপজাতি ভিসিগথদের নেতা ছিলেন। রোম সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের আমলে অ্যালারিক রোমের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। ফ্রাঙ্ক উপজাতির নেতা আর-বোগাস্ট এই সময় বেশ কয়েকবার রোম আক্রমণ করে। অ্যালারিক প্রতিটি যুদ্ধে খুব বীরত্বের পরিচয় দিয়ে আরবোগাস্টকে পরাজিত করেন। সম্রাট থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যুর পর সম্রাট হনোরিয়াস রোমের সিংহাসনে বসেন। হনোরিয়াসের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে অ্যালারিক সম্রাটের শত্রুতে পরিণত হন। এই সময় পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে ওঠে। ফলে অ্যালারিক

পশ্চিমগথ উপজাতির জন্য নতুন বাসস্থানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। অ্যালারিকের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ভ্যাণ্ডাল উপজাতির নেতা স্টিলিডো। আততায়ীর হাতে স্টিলিডোরের মৃত্যু হলে অ্যালারিক কয়েকবার রোম আক্রমণ করে এবং রোমের অধিবাসীদের কাছ থেকে প্রচুর ধন-রত্ন আদায় করে। কিন্তু ভিসিগথ বা পশ্চিমগথরা তাদের জন্য রোমে বাসস্থান সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। তখন অ্যালারিক উত্তর আফ্রিকায় তার সঙ্গীদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান খুঁজে বার করার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে। কিন্তু ৪১১ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ অ্যালারিকের মৃত্যু হয় এবং ভিসিগথ বা পশ্চিমগথদের জন্য কোন স্থায়ী বাসস্থান খুঁজে বার করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

অ্যাটিলা: হূণদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন অ্যাটিলা। তাঁর নেতৃত্বে ৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হুণজাতি বারবার পূর্ব-রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণে ভীত হয়ে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হুণদের কর দিতে বাধ্য হন। তারপর পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের উপর হূণজাতি আক্রমণ শুরু করে। বিশাল একদল সৈন্য নিয়ে অ্যাটিলা রাইন নদী পেরিয়ে গল দেশে (বর্তমান ফ্রান্স) পৌছান। গথ, ফ্রাঙ্ক, বার্গাণ্ডিয়ান ও রোমের অধিবাসীরা একযোগে তাদের বাধা দিতে চেষ্টা করে। ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্যালোনে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয় এবং এই যুদ্ধে হূণরা পরাজিত হয়। ফলে অ্যাটিলা দক্ষিণ দিকে পালিয়ে আসেন এবং ইটালী আক্রমণ করেন। ইটালীর সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অ্যাটিলাকে প্রতিরোধ করা অথবা তাঁর হাত থেকে রোম নগরী রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু রোমের বিশপ লিওর বিচক্ষণতার জন্য রোম নগরী হূণদের হাত থেকে রক্ষা পায়। বিশপ লিও নির্ভয়ে অ্যাটিলার দুর্গে প্রবেশ করে এবং তাঁকে রোম আক্রমণ করতে নিষেধ করেন। তিনি অ্যাটিলাকে একথাও জানান যে, রোম আক্রমণ করলে ঈশ্বর তার প্রতিশোধ নেবেন। লিওর অনুরোধের জন্যই হোক বা ঈশ্বরের

ভয়েই হোক, অ্যাটিলা রোম আক্রমণ না করে নিজের রাজ্যে ফিরে যান। ৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাটিলার মৃত্যু হয়।

গ্যাসেরিক: গ্যাসেরিক ছিলেন ভ্যাণ্ডাল উপজাতিদের নেতা। স্পেনে ভ্যাণ্ডালদের একটি উপনিবেশ ছিল। কিন্তু ভিসিগথদের নিকট পরাজিত হয়ে ভ্যাণ্ডালরা স্পেন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তারপর ৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডালরা গ্যাসেরিকের নেতৃত্বে উত্তর আফ্রিকায় আশ্রয় নেয়। দীর্ঘ দশ বছর যুদ্ধ করে ভ্যাণ্ডালরা রোমের সৈন্যদের পরাজিত করে এবং কার্থেজ শহরটি জয় করে নিতে সমর্থ হয়। গ্যাসেরিক ও তাঁর দলবল তখন ভূমধ্যসাগরে জলদস্যুতা করতে শুরু করেন। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যাণ্ডালরা রোম আক্রমণ করে। রোম সম্রাট ভ্যালেন্টিনিয়ান ভ্যাণ্ডালদের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। রোম জয়ের পর ভ্যাণ্ডালরা রোমের অধিবাসীদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করে ও প্রচুর ধনসম্পত্তি লুঠপাট করে। রোমের বিশপ লিও গ্যাসেরিককেও রোম আক্রমণ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু গ্যাসেরিক তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন নি। গ্যাসেরিকের নেতৃত্বেই পশ্চিম সিসিলিতে ভ্যাণ্ডালদের রাজ্য স্থাপিত হয়।

তৃতীয় পাঠ

জার্মান উপজাতিদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন

গথ, ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক, লোম্বার্ডস্, বার্গাণ্ডিয়ান প্রভৃতি জার্মান উপজাতিরা দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বসতি গড়ে তোলার আগে প্রায় যাযাবরের জীবনযাপন করত। খাদ্য-সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্থানে তারা ঘুরে বেড়াত। চাষবাসের কাজেও তারা কোন উন্নতি করতে পারে নি। পশুপালন, মাছ-ধরা, শিকার-করাই ছিল তাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়। পুরুষরা শিকার ও যুদ্ধ করত এবং মেয়েরা সংসারের দায়-দায়িত্ব পালন করত। দক্ষিণ ইউরোপের ইটালী বা গ্রীসদেশের সঙ্গে তাদের কোনরকম যোগাযোগ না-থাকার ফলে তাদের সমাজজীবনে কোনরকম পরিবর্তন হয় নি। বাইরের

জগতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সঙ্গেও তাদের কোন পরিচয় ঘটে নি। তবে ন্যায় ও নীতির প্রতি তারা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত। পরিবারের পবিত্রতা রক্ষার দিকে তাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

রক্তের সম্বন্ধের উপরই জার্মান উপজাতিদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠত। রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। সাধারণতঃ কোন বীর ও সাহসী নেতার প্রতি তারা অনুগত থাকত। কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার পরিবর্তে, তারা সেই বীর ও সাহসী নেতার নির্দেশে চলত। যে-কোন উপজাতির প্রত্যেকটি লোকই তাদের নেতার নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকত। এই সব উপজাতির প্রত্যেকেই যুদ্ধবিদ্যায় খুব পারদর্শী হত।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এইসব উপজাতির রাজনৈতিক জীবনে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই কয়েকটি উপজাতি মিলে একটি সংঘ গড়ে তুলত। রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলেই এরূপ দুটি সংঘ গড়ে ওঠে।

জার্মান উপজাতিদের ধর্মজীবন ছিল খুব সহজ, সরল। তারা সাধারণতঃ বন, জঙ্গল, বিল, হ্রদ, কুয়াশা, বিদ্যুৎ প্রভৃতির পূজা করত। তবে দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করার পূর্বেই তাদের অনেকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। উলফিলাস নামে একজন খ্রীষ্টান পুরোহিত উপজাতিদের ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। তবে জার্মান উপজাতিদের মধ্যে অ্যারিয়ান খ্রীষ্টধর্ম বেশী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

হূণজাতির আক্রমণে ভীত হয়ে জার্মান উপজাতিরদের মধ্যে অস্ট্রোগথরা প্রথমে রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে। অ্যালারিকের নেতৃত্বে তারা গ্রীস ও ইটালি অতিক্রম করে স্পেনে পৌঁছায়। এই সময় তারা রোম নগরী আক্রমণ ও লুঠতরাজ করার সুযোগও পায়। শেষ পর্যন্ত সেখানেই তারা স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করে।

পূর্বগথদের পর রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে পশ্চিমগথরা। পশ্চিমগথদের নেতা থিয়োডোরিকের নেতৃত্বে তারা মধ্য-ইটালীতে বসতি স্থাপন করে। তারপর রোম সাম্রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়

ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক, লোম্বার্ডস্ ও বার্গাণ্ডিয়ান উপজাতিগণ। ভ্যাণ্ডালরা উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ অধিকার করে। ভ্যাণ্ডাল নেতা গ্যাসেরিকের

নেতৃত্বে তারা রোম আক্রমণ করে এবং সেখানে নির্দয়ভাবে লুঠতরাজ চালায়। রোম উপত্যকায় গড়ে উঠে বার্গাণ্ডিয়ানদের উপনিবেশ। লোম্বার্ডস্‌দের বসতি গড়ে ওঠে পো-নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। লোভিসের

নেতৃত্বে ফ্রাঙ্করা গলদেশ (বর্তমান ফ্রান্স) অধিকার করে। অ্যাঙ্গলস, জুটস্ ও স্যাক্সন জাতি ব্রিটেন অধিকার করে। সুয়েভিন উপজাতি উত্তর-পশ্চিম স্পেন ও আলেমান্নিরা সুইজারল্যাণ্ড অধিকার করে। পরবর্তীকালে জার্মান উপজাতিদের মধ্যে ফ্রাঙ্করাই সবচেয়ে বেশী প্রভাব-শালী ও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জার্মান উপজাতিরা পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই বসতি স্থাপন করে। রোম সাম্রাজ্যের গৌরবের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। যে জার্মান উপজাতিদের রোমের অধিবাসীরা বর্বর বলে মনে মনে ঘৃণা করত, তারাই রোম সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী হয়ে ওঠে। রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করার ফলে এইসব জার্মান উপ-জাতিদের সঙ্গে রোমের জনসাধারণের সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সব উপজাতিরা রোমের আইন, ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ ক'রে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের ছুটি সভ্যতা ও জাতির মিলনের এই যুগে খ্রীষ্টানদের গীর্জা-গুলো রোম সাম্রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। তাদের প্রভাবে জার্মান উপজাতিদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা অনেক পরিমাণে কমে যায়। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান জার্মান উপজাতিরা রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করলেও রোমের সভ্যতা ও ধর্ম সম্পূর্ণভাবে তাদের জয় করে নেয়। রোমের সভ্যতার সঙ্গে জার্মান উপজাতিদের সভ্যতার মিলনের ফলে ইউরোপে একটি নূতন যুগের সূচনা হয়।

অনুশীলনী

১। ইউরোপের মধ্যযুগ বলতে কি বুঝা যায় ?

২। পশ্চিমরোম সাম্রাজ্যে জার্মান উপজাতিরা কিভাবে কর্তৃত্ব স্থাপন করে ?

৩। রোমের আইন ও রোম সম্রাটের গুরুত্ব সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৪। অ্যালারিক সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৫। অ্যাটিলা সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৬। গ্যাসেরিক সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৭। জার্মান উপজাতিদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন কেমন ছিল ?

৮। ইউরোপের কোন্ অঞ্চলে কোন্ জার্মান উপজাতি অধিকার স্থাপন করে ?

৯। রোম সাম্রাজ্যের উপর জার্মান উপজাতিদের অধিকার স্থাপনের ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১০। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) হূণজাতিরা কোথায় বাস করত ? তাদের আক্রমণের ফলে জার্মান উপজাতিরা কি করতে শুরু করে ?

(খ) রোম অধিকারের পূর্বে জার্মান উপজাতিদের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল ?

(গ) অডোয়াসার কে ছিলেন ? তার সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

(ঘ) থিয়োডোরিক কে ? তার সম্পর্কে কি জান ?

(ঙ) জার্মান উপজাতিদের ধর্ম কিরূপ ছিল ? তাদের মধ্যে কে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন ?

১১। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) অ্যাড্রিয়ানোপলের যুদ্ধ কোন্ বছর হয় ?

(খ) রোমের শেষ সম্রাটের নাম কি ?

(গ) হূণদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাজা কে ?

(ঘ) পশ্চিমগথদের প্রধান নেতার নাম কি ?

(ঙ) ভ্যাণ্ডালদের শ্রেষ্ঠ নেতার নাম কি ?

১২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) ৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমের সম্রাট —মৃত্যু হয়।

(খ) ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে — — পরাজিত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করে।

(গ) পূর্বগথদের পর রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে —।

(ঘ) — সম্পর্কের উপরই জার্মান উপজাতিদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠত।

(ঙ) জার্মান উপজাতিদের ধর্মজীবন ছিল খুব — ও সরল।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

ইউরোপের মধ্যযুগ—অন্ধকার যুগ নয়

[ইউরোপের ইতিহাসে চতুর্থ থেকে সপ্তম খ্রীষ্টাব্দ]

সাধারণভাবে ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যযুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। কিন্তু এই যুগকে অন্ধকার যুগ বলার বিশেষ কোন যুক্তি নেই। তবে এই সময়ের অনেক ঘটনা বা কাহিনী সঠিকভাবে জানা যায় না বলে এ যুগকে হয়ত অন্ধকার যুগ বলা যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে নবজাগরণ যুগের পণ্ডিতগণই মধ্যযুগকে অন্ধকারময় যুগ প্রথম বলেন। কারণ মধ্যযুগে প্রাচীন কালের কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি যথেষ্ট অবহেলিত ছিল। এই যুগের লোকেরা প্রাচীন, যুগের সভ্যতার কোন গুরুত্ব বুঝতে পারে নি। বর্বর জাতির আক্রমণ ও তাদের নিষ্ঠুর ধ্বংস লীলার জন্য এই যুগকে 'অন্ধকার' যুগ বলা হয়। তবে এই যুগ সম্পূর্ণ 'অন্ধকারময়' নয়। কারণ এই যুগেই রোমের আইন প্রণীত হয়, মঠ ও গীর্জায় বিদ্যা-চর্চা শুরু হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। এ কথা ঠিক যে, জার্মানীর উপজাতি—প্রথম যখন পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে শুরু করে, তখন গ্রীস বা রোমের সভ্যতা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিল না। রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের উপর নিজেদের অধিকার স্থাপন করতেই তারা ব্যস্ত ছিল। তাদের পক্ষে গ্রীস বা রোমের সভ্যতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নি। বিশেষতঃ জার্মান উপজাতিদের বারবার আক্রমণের ফলে রোমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে জার্মানীর উপজাতিরাই পশ্চিম ইউরোপের পুরানো সভ্যতাকে ভিত্তি করে আর একটি নতুন এবং আরও উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলার পথ প্রস্তুত করে। তাছাড়া পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের উপর জার্মানীর উপজাতিরা কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এই যুগে আরব অঞ্চলেও একটি নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে। যে-যুগে বাইজান্ট্যাইন

সভ্যতা অথবা আরব সভ্যতার মত উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে, সে-যুগকে কোন মতেই অন্ধকার যুগ বলা উচিত নয়।

দ্বিতীয় পাঠ

শিক্ষার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মঠগুলোর দান

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু খ্রীষ্টানদের গীর্জা ও খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীদের মঠগুলো ধীরে ধীরে আবার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। সাধারণতঃ গীর্জার সঙ্গেই সন্ন্যাসীদের বাস করার জন্য মঠ তৈরি হত। মঠের সন্ন্যাসীরা কৃষি-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সাধারণ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে চেষ্টা করেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেক দক্ষ ও উচুদরের শিল্পী ছিলেন। মঠের অধীনেই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র থাকত। সন্ন্যাসীরা কৃষিভূমিতে জল নিকাশ করে, পতিত জমি পরিষ্কার করে, অনেক নতুন নতুন জমি তৈরি করতেন। জমিতে নতুন নতুন ফসল ফলানোর দিকেও তাঁদের বেশ ঝোঁক ছিল। তাঁরা পশুপালনেও অনেক উন্নতি করেন। তাঁদের এসব কাজের ফলে সাধারণ লোক খুব উপকৃত হত। তবে ধর্ম ও নৈতিক জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল বেশি। পুরানো পুঁথিপত্র সংগ্রহ ও রক্ষা করা এবং নতুন গ্রন্থ রচনা করার দিকেও তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য তাঁরা বিশেষভাবে চেষ্টা করতেন। সে যুগের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই এই সব মঠে আশ্রয় পেতেন এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ পেতেন। কারণ মধ্যযুগে এইসব মঠই ছিল শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র। প্রায় আটশ' বছর ধরে এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করে। এইসব মঠের সন্ন্যাসী এবং শিক্ষকরা বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানতার হাত থেকে জনসাধারণকে উদ্ধার করে এবং জ্ঞানের আলোর সন্ধান

দেয়। শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে সন্ন্যাসী বেনিডিক্টের আদর্শে গড়ে-ওঠা মঠগুলোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। পরবর্তীকালে এইসব মঠের অনেক স্কুলকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্য পঠন ও পাঠনে এইসব মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় পাঠ্য-পুস্তকের অভাবের জন্য তাঁরা ঐ বই পড়াতে এবং সতর্কভাবে রক্ষা করতে বাধ্য হন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁরা ঐসব গ্রন্থ রক্ষার সুব্যবস্থা করেন এবং শুধু মধ্যযুগের নয়, সমস্ত যুগের মানবজাতির এক বিরাট উপকার সাধন করেন।

তৃতীয় পাঠ

ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে যাজকদের ধারণা : সভ্যতার উপর তার প্রভাব

রোম সাম্রাজ্য পতনের পর ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে অরাজকতা ও রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দেয়। এই যুগে খ্রীষ্টানদের ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে খ্রীষ্টান যাজকরাও তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার বিশেষ সুযোগ পায়। দেশের জনসাধারণও ধীরে ধীরে সমস্ত কিছুর জন্য তাদের উপর নির্ভর করতে শুরু করে এবং যাজকদের কথাকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেয়। সংসারের সুখে লিপ্ত থাকা, প্রতিবেশীর সম্পত্তির প্রতি লোভ করা, অপরের জিনিসপত্র চুরি করা প্রভৃতি বিষয়কে যাজকরা অন্যায় বলে মনে করত। আর সকলের প্রতি নিজের ভাইয়ের মত ব্যবহার করা, সৎভাবে জীবনযাপন করা এবং এই জগতের অল্পদিনের জীবনকে সৎকাজে ব্যয় করে স্বর্গলোকের দীর্ঘজীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়াকে ন্যায় বলে মনে করত। চার্চ ও যাজকদের প্রতি শ্রদ্ধা, নারীদের যথাসাধ্য সাহায্য করা, ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা রক্ষা এবং চুক্তি অনুসারে কাজ করা প্রভৃতি খ্রীষ্টাননের কর্তব্য বলে মনে করা হত।

খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর বর্বর উপজাতিরাই যাজকদের প্রভাবে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রধান সমর্থক হয়ে ওঠে। যাজকদের প্রভাবে বর্বর জাতিদের জীবনযাত্রার অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং তারা ধীরে ধীরে সভ্যতার স্পর্শ লাভ করে।

অনুশীলনী

১। ইউরোপের মধ্যযুগকে কি অন্ধকার যুগ বলা হয়?

২। মধ্যযুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান সন্নাসীদের মঠগুলোর দান সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে খ্রীষ্টান যাজকদের কিরূপ ধারণা ছিল? কিভাবে তাদের ধারণা সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে?

৪। মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে যাজকদের প্রভাব সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৫। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) মঠের সন্নাসীরা মধ্যযুগের কৃষকদের কি ভাবে সাহায্য করতেন?

(খ) মধ্যযুগের দুইটি বিখ্যাত সভ্যতার নাম কর। সে দু'টি কোথায় কোথায় গড়ে ওঠে?

৬। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(ক) সাধারণভাবে ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগকে—বলা হয়।

(খ) মধ্যযুগে সন্ন্যাসীদের মঠগুলোই ছিল—প্রধান কেন্দ্র।

(গ) যাজকরা—অনেক উন্নতি করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্য

প্রথম পাঠ

সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইনের আমলে কনস্ট্যাণ্টাইন নগরীর পত্তন

৩০৬ থেকে ৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কনস্ট্যাণ্টাইন রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। এই সময় জার্মান উপজাতিরা বার বার রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম নগরী আক্রমণ করার চেষ্টা করে। বিশাল রোম সাম্রাজ্য ভালভাবে শাসন করা ও বাইরের শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করতে উদ্যোগী হন। তিনি ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে পুরানো দিনের গ্রীক উপনিবেশ বাইজ্যান্টিয়ামে রোম সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি নতুন রাজধানীর স্থান নির্বাচনে বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার

পরিচয় দেন। ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থলে বস্‌ফোরাস প্রণালীর কাছে বাইজ্যান্টিয়াম অবস্থিত। সম্রাটের নাম অনুসারে নতুন রাজধানীর নাম হয় কনস্ট্যান্টিনোপল বা কনস্ট্যাণ্টাইনের শহর। অল্পদিনের মধ্যেই রোম সাম্রাজ্যের এই নতুন রাজধানী ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

খৃষ্টধর্ম পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্মরূপে ঘোষণা

প্রথম জীবনে সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী ছিলেন। খ্রীষ্টানদের উপর তিনি নানাপ্রকার অত্যাচার করেন। কিন্তু ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর মিলান শহর থেকে প্রচারিত এক নির্দেশের দ্বারা তিনি খ্রীষ্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যের ধর্ম বলে ঘোষণা করেন। খ্রীষ্টানদের

প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য তিনি রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের নির্দেশ দেন। কিন্তু সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন নিজে কখনও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নি। সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইনের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একবার শত্রুদের আক্রমণে তাঁর জীবন ও সিংহাসন বিপন্ন হয়ে পড়ে। তখন তিনি শপথ গ্রহণ করেন যে যুদ্ধে শত্রুদের পরাজিত করতে পারলে তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হবেন। যুদ্ধে শত্রুদের পরাজিত করার পর তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই তিনি খ্রীষ্টধর্মকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। তবে তখনও রোম সাম্রাজ্যের পুরানো ধর্মমত যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।

দ্বিতীয় পাঠ

সম্রাট জাস্টিনিয়ান : রোম সাম্রাজ্যে পুনরায় ঐক্য স্থাপনের জন্য সম্রাট জাস্টিনিয়ানের চেষ্টা

৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে থিয়োডোসিয়াসের মৃত্যুর পর রোম সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় রোম ও পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় কনস্ট্যান্টিনোপল। জার্মানীর বিভিন্ন উপজাতির আক্রমণে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু সামরিক শক্তির সাহায্যে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

৫২৭ থেকে ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে ছিলেন সম্রাট জাস্টিনিয়ান। জাস্টিনিয়ানের শাসনকাল থেকেই পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগের সূচনা হয়। অনেক দিন পূর্বেই রোম সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেও, পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের শাসকরা কোনদিনই রোম সাম্রাজ্য ও তার রাজধানী রোমের পূর্ব গৌরবের কথা ভুলতে পারেন নি। কোষাগারে সঞ্চিত অর্থ এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সাহায্যে সম্রাট জাস্টিনিয়ান দু'ভাগে বিভক্ত রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে আবার রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান

উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও ইটালীর রোমান অধিবাসীরাও সম্রাটকে এই ব্যাপারে উৎসাহ দেয়।

৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ান এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তর আফ্রিকায় উপস্থিত হন। পর পর দুটি যুদ্ধেই ভ্যাণ্ডালরা তাঁর

কাছে পরাজিত হয়। কিছুদিনের জন্য উত্তর আফ্রিকায় কনস্ট্যান্টি-নোপলের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ভ্যাণ্ডালদের শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না করেই জাস্টিনিয়ানের সেনাপতি বেলিসারিয়াস ইটালীর অস্ট্রোগথদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। ইটালীর ও কনস্ট্যান্টি-নোপলের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। র‍্যাভেনায় আবার ইটালীর রাজধানী স্থাপিত হয় এবং জাস্টিনিয়ানের নির্দেশে একজন শাসক ইটালীর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

উত্তর আফ্রিকা ও ইটালী থেকে জার্মান উপজাতিদের বিতাড়িত করলেও জাস্টিনিয়ান ঐ অঞ্চল থেকে ভিসিগথদের বিতাড়িত করার কোন চেষ্টা করেন নি। গলদেশের ফ্রাঙ্কদেরও দমন করার জন্য তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। এমন কি পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের সীমানা সঠিকভাবে নির্দেশ করা এবং তাকে সুরক্ষিত করে তোলা যে একান্ত প্রয়োজন—একথাও তিনি কখনও বুঝতে পারেন নি। ফলে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সৈন্যরা চলে আসার পরই জার্মান উপজাতির লোকেরা আবার ঐ সব অঞ্চল অধিকার করে। সম্রাট জাস্টিনিয়ান দুই রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা কখনও বাস্তবে সম্ভব হয় নি।

তৃতীয় পাঠ

সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আইন-সংকলন—সংকলনের গুরুত্ব

জাস্টিনিয়ানের শাসনকালের পূর্বে রোম সাম্রাজ্যে কোন লিখিত আইন ছিল না। বিচারকগণ নিজেদের ইচ্ছামতই বিচার করতেন। ফলে অনেক রকম অসুবিধা দেখা দিত। এইসব অসুবিধা দূর করার জন্য সম্রাট জাস্টিনিয়ান রোমের প্রচলিত আইনকে বিজ্ঞান-সম্মত ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং লিখিত ভাবে তা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। প্রচলিত আইন সংকলনের জন্য বিখ্যাত আইনবিদ্ ট্রিবোলিয়নের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। আইন-

গুলো ভালভাবে পরীক্ষা করা, বিজ্ঞান সম্মততাবে সেগুলো শ্রেণীবদ্ধ করা, পরিষ্কার ভাবে তাদের ব্যাখ্যা করা এবং অপ্রচলিত আইন বাতিল করা ছিল এই কমিটির প্রধান দায়িত্ব। এই কমিটির দ্বারা সংকলিত আইন দেওয়ানী আইন সংকলন নামে পরিচিত। এই সংকলন চার ভাগে বিভক্ত: প্রচলিত আইন ও সম্রাটদের আদেশ, আইন ও আদেশের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম, ছাত্রদের জন্য রোমের আইন সংকলন এবং সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আমলের নতুন আইনসমূহ।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সংকলিত আইনের গুরুত্ব যথেষ্ট। পরবর্তীকালে প্রায় ইউরোপের সকল দেশই রোমের আইনের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে নিজেদের দেশের আইন রচনা করে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রোম শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অনেক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে, কিন্তু রোমের আইনের গুরুত্ব একটুও কমেনি।

শিল্পকলা, অঙ্কনশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের শিল্প, অঙ্কন-শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য খুব উন্নত ছিল। সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন কনস্ট্যান্টিনোপল শহরের পত্তন করার পর, শহরটিকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গ্রীকদের বিভিন্ন শহরে যে-সব সুন্দর সুন্দর দেব-দেবীর মূর্তি ও অন্যান্য শিল্পের নিদর্শন তখনও অক্ষত অবস্থায় ছিল, তিনি সেগুলো সংগ্রহ করে কনস্ট্যান্টিনোপলে নিয়ে আসেন। ফলে কনস্ট্যান্টিনোপল গ্রীক শিল্পকলা ও স্থাপত্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান শিল্পকলা, অঙ্কন-শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কনস্ট্যান্টিনোপলের বিখ্যাত সেণ্ট সোফিয়া গীর্জাটি তিনিই নির্মাণ করেন। নানারঙের সুন্দর সুন্দর মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরী এই বিশাল ও সুউচ্চ সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা

বাইজ্যান্টাইন স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। গীর্জার প্রাচীরে পাথরের উপর নানারকম ছবি আঁকা আছে। যীশুখ্রীষ্টের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী এইসব ছবিতে দেখানো হয়েছে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল অধিকার করার পর তারা সেণ্ট সোফিয়া গীর্জাকে মসজিদে পরিণত করে। মারমোরা সাগরের তীরে সম্রাট প্রথম ব্যাসিলের নির্মিত রাজপ্রাসাদটিও বাইজ্যান্টাইন স্থাপত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাচীর চিত্র বা ফ্রেস্কো খুব উন্নত।

দক্ষ শিল্পীরা গীর্জার প্রাচীরে নানাবর্ণের সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতেন। এই সব ছবির অনেকগুলো এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। যীশুখ্রীষ্টের জীবন-কাহিনী নিয়ে নানারকম ছোট ছোট ছবিও এই সময় আঁকা হত। এইসব ছোট ছোট ছবি সোনার ফ্রেম দিয়ে বাঁধিয়ে মূল্যবান পাথর দিয়ে অলঙ্কৃত করা হত। হাতের লেখা পুঁথিপত্রেও নানারকম সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা হত।

বাইজ্যান্টাইন শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য গ্রীক, রোমান ও পারস্যের শিল্পের অপূর্ব সংমিশ্রণ। পারস্যের স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের গীর্জাগুলোর গম্বুজ তৈরি করা হয়। ইউরোপের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপর বাইজ্যান্টাইন শিল্প যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। রোম, র‍্যাভেনা, ভেনিস প্রভৃতি স্থানের এই যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বাইজ্যান্টাইন শিল্পের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের গুরুত্ব

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ বাইজ্যান্টাইন সভ্যতা গ্রীসের সভ্যতার ন্যায় নগর-কেন্দ্রিক ছিল। সাধারণতঃ কোন শিল্পের উপর নির্ভর করেই

এই সব নগরের উৎপত্তি হয়। রাজ্যের অভিজাত শ্রেণী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং বড় বড় জমিদারগণ এই নগরে বাস করত। এই সব লোকেরাই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করত। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উপর ভিত্তি করেই বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি গড়ে ওঠে। পঞ্চম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাইজ্যান্টিয়ামের সমৃদ্ধি সমানভাবে অটুট ছিল। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের ব্যাপারেও কনস্ট্যান্টিনোপল সমান গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করত।

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ঃ বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মশলা, ঔষধপত্র, নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য, মূল্যবান ধাতু, সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার, বিভিন্ন প্রকার সুন্দর ও রঙীন কাঁচ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ইউরোপের দেশগুলোতে পাঠাবার ব্যবস্থা করত। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে সম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনেক বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এইসব বাণিজ্য কেন্দ্রের মধ্যে কন্‌স্ট্যান্টিনোপল, অ্যান্টিয়োক, দামাস্কাস, বেইরুট, থেসালোনিকা, আলেকজাণ্ড্রিয়া ও করিন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের মত বাইজ্যান্টিয়ামের শিল্পও যথেষ্ট উন্নত ছিল। এই সব শিল্পের মধ্যে বয়নশিল্প ছিল সর্বপ্রধান। চীনদেশ থেকে রেশমের কাপড় প্রভৃতি আমদানি করা হত এবং তারপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তা পাঠানো হত। সোনা ও রূপার বিভিন্ন প্রকার অলংকার, বিভিন্ন ধাতু দ্বারা অনেক রকম খেলনা এবং অস্ত্রশস্ত্র সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেই তৈরি হত। দেশের জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য দেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হত। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির উন্নতির ফলে পূর্বরোম সাম্রাজ্যের উন্নতি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সাহিত্যঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের বিশেষ

উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হয়নি। তবুও কয়েকজন লেখক সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যে পুরানো দিনের গ্রীক ও রোমের সাহিত্যের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের কোন বিরোধিতা ছিল না। এই বিষয়ে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা খুব উদার ও সহিষ্ণু ছিলেন। পুরনো দিনের গ্রীক সাহিত্য নকল ও রক্ষা করার দিকে তাঁদের যথেষ্ট ঝোঁক ছিল। তাঁদের এই কাজের ফলেই গ্রীক সাহিত্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। বাইজ্যান্টাইনের সভ্যতার প্রথম যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে প্লুটার্ক ও লুসিয়ানই সবচেয়ে বিখ্যাত।

পুরানো দিনের সাহিত্য নকল ও রক্ষা করা ব্যতীত পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের পণ্ডিতগণ বিশ্বকোষ ও অভিধান রচনা করেন। ইতিহাস, সাধু-সন্নাসীর জীবনী, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি রচনার ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই সময় পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যে অনেক কবি জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাটদের মধ্যে অনেকে যথেষ্ট পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহারা সাহিত্যিক ও কবিদের নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। সম্রাটদের মধ্যেও কেউ কেউ সাহিত্য রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সম্রাট চতুর্থ কনস্ট্যান্টাইন "প্রথম ব্যাসিলের জীবনী" ছাড়াও শাসনতন্ত্র ও বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। স্থইডাস এবং সেলাস—এই যুগের দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিক।

দর্শন ঃ পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যে দর্শনশাস্ত্র বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করে। প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকদের রচিত গ্রন্থগুলো সেখানে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন প্লেটো। যদিও এই সময়ের বাইজ্যান্টাইনের দার্শনিকদের মতবাদ ছিল রহস্যময় ও দুর্বোধ্য, তথাপি ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁরা যে-সব মতামত প্রকাশ করেন, তার মধ্যে অনেক নতুন চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের এই নতুন চিন্তাধারা পরবর্তী যুগের মানুষের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

বিজ্ঞান ঃ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা খুব উন্নত ছিল। গণিত-শাস্ত্র, ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্ট্র্যাবো ও টলেমির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্ট্র্যাবো-র লেখা "ভূগোল" থেকে সে সময়ের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে নানা কথা জানা যায়। টলেমি তেরোটি খণ্ডে বিভক্ত "গ্রেট সিন্‌থেসিস" নামে একখানা বিশ্বকোষ রচনা করেন। চন্দ্র, বুধ, মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি, শনি ও পৃথিবীর গতি ও গতিপথ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্র এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করে। রাশিচক্র এবং নক্ষত্র সম্বন্ধেও তাদের জ্ঞান বেশ উন্নত ছিল।

গ্রীকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়ের পূর্বে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে রোমানদের জ্ঞান ছিল খুবই সামান্য। কিন্তু শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পাকা নর্দমার ব্যবস্থা করা, নিয়মিত জল সরবরাহ ও অন্যান্য বিষয়ে তাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। রোমের লোকেরাই সর্বপ্রথম হাসপাতাল নির্মাণের ব্যবস্থা করে। বিশেষভাবে সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালগুলো তৈরি হয়। রোমানরা গাছ, গুল্ম ও লতা-পাতা দিয়ে অনেক ঔষধপত্র তৈরি করত।

বাইজ্যান্টাইনের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে সেলসাস ও গ্যালেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সেলসাস মেনিন-জাইটিস ও অ্যাপেনডিসাইটিসের উপসর্গ নির্ণয় করেন। তাঁর লেখা "অন মেডিসিন" খুব উন্নত ধরণের গ্রন্থ। গ্যালেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উপর দেড়শ গ্রন্থ লেখেন। এই সব গ্রন্থে তিনি শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম, নাড়ীর গতি, প্রকৃতি, স্নায়ু ও পেশী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করেন। তবে দার্শনিক মতবাদের সাহায্যে রোগের কারণ নির্ণয় করার ফলে, তাঁর সিদ্ধান্তে কিছু কিছু ভুল দেখতে পাওয়া যায়। পল এবং আলেকজাণ্ডার এই যুগের অন্য দু'জন বিখ্যাত চিকিৎসক।

অনুশীলনী

১। কনস্ট্যান্টিনোপল কে, কবে এবং কোথায় স্থাপন করেন? এই শহরের গুরুত্ব সম্বন্ধে কি জান?

২। রোম সাম্রাজ্যের ঐক্য স্থাপনের জন্য সম্রাট জাস্টিনিয়ান কিভাবে চেষ্টা করে?

৩। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আইন-সংকলন সম্বন্ধে কি জান? সম্রাট জাস্টি-নিয়ানের আইনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪। বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে কি জান?

৫। বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। বাইজ্যান্টাইন সভ্যতার সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে কি যান?

৭। বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৮। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন কেন খ্রীষ্টধর্মকে সাম্রাজ্যের ধর্মরূপে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন?

(খ) রোম সাম্রাজ্যের ঐক্য স্থাপন করতে কেন সম্রাট জাস্টিনিয়ান ব্যর্থ হন?

(গ) সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা সম্বন্ধে কি জান?

(ঘ) বাইজ্যান্টাইন শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? ইউরোপের কোথায় কোথায় এই শিল্প প্রভাব বিস্তার করে?

(ঙ) বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রের নাম লিখ। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কোন্ কোন্ বাণিজ্য দ্রব্য তৈরী হত?

(চ) গ্রেট সিনথেসিস কবে লেখা? এই বই থেকে কি কি জানা যায়?

৯। এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) কনস্ট্যান্টিনোপল শহরটি কোন্ বছরে স্থাপিত হয়?

(খ) সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সেনাপতির নাম কি?

(গ) কোন খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে?

(ঘ) চীনদেশ থেকে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যে কি আমদানি হত?

(ঙ) প্রথম ব্যাসিলের জীবনী কে লেখেন?

(চ) 'অন মেডিসিন' কার লেখা?

(ছ) মেনিনজাইটিস ও অ্যাপেনডিসাইটিসের উপসর্গগুলো কে আবিষ্কার করেন ?

১০। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগ স্থলে—কাছে—অবস্থিত।

(খ) ৫২৭ থেকে ৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে ছিলেন সম্রাট—।

(গ) —শিল্পকলা, অঙ্কনশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

(ঘ) বাইজ্যান্টাইন শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য —, — ও — শিল্পের অপূর্ব মিশ্রণ।

(ঙ) — ও — এই যুগের দু'জন বিখ্যাত সাহিত্যিক।

১১। সঠিক উত্তরটিতে এই চিহ্ন (√) দাও :

(ক) ৩৩০/৩৩১/৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল শহর স্থাপিত হয়।

(খ) ১৪৫১/১৪৫২/১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে।

(গ) কনস্ট্যান্টাইন/থিয়োডোসিয়াস/জাস্টিনিয়ান রোমের আইন সংকলন করেন।

(ঘ) প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন সক্রেটিস/প্লেটো/এ্যারিস্টোটল।

(ঙ) "অন মেডিসিন" বইটির লেখক গ্যালেন/সেলসাস/আলেকজাণ্ডার।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামধর্মের উত্থান ও প্রভাব

প্রথম পাঠ

আরব ও আরবের লোক

নীল নদের উপত্যকা হতে শুরু করে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা অঞ্চল পর্যন্ত ভূখণ্ড আরব নামে পরিচিত।

আরব দেশের বেশির ভাগ অঞ্চল মরুভূমি। যে-সব অঞ্চলে জল পাওয়া যায়, যেখানে উর্বর জমি, মরূদ্যান ও খেজুর গাছ দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর দিকে প্যালেস্টাইন থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত ভূখণ্ডে

মোটামুটি উর্বর জমির সন্ধান পাওয়া যায়। লোহিত সাগরের তীরের জমিও উর্বর এবং কৃষিকার্যের উপযোগী। আরব অঞ্চলের দক্ষিণ সীমান্তে ইয়েমেন এবং উত্তর দিকের শেষপ্রান্তে হেজ্জাজ অবস্থিত। আরবের হু'টি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন শহর মক্কা ও মদিনা হেজ্জাজেই অবস্থিত।

আরবের মরুভূমি অঞ্চলে যাযাবর জাতির লোকেরা বাস করত। নিজেদের ও গৃহপালিত পশুদের খাদ্যের সন্ধানে তারা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াত। এইসব যাযাবর জাতিদের বেদুইন বলা হত।

পশুপালনই ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। কৃষিকার্য তারা জানত না। আরবের বিভিন্ন জাতি বা দলের মধ্যে সব সময়ই সংঘর্ষ লেগে থাকত। প্রত্যেক জাতিই আলাদা ধরণের রীতি-নীতি ও আইন-কানুন মেনে চলত।

তবে এইসব বেদুইনদের মধ্যে হেজ্জাজ ও ইয়েমেনের লোকেরা সর্বপ্রথম তাদের যাযাবরের জীবনযাত্রা ত্যাগ ক'রে স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে কৃষিকাজও তারা শিখে নেয়। এমনকি আবিসিনিয়া ও ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যও শুরু করে। তবে তখনও তাদের কোন সংগঠিত রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি।

আরবের লোকেরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করত। পাথর, গাছ, ঝরণা, কূপ প্রভৃতিকে তারা দেবতার ন্যায় পূজা করত। জিন অথবা শয়তানের অস্তিত্বেও তারা বিশ্বাস করত। জাহুবিদ্যা এবং অলৌকিক শক্তিতেও আরবের লোকেদের প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল। তবে এই সময় আরবের অনেক জায়গায় দেবতাদের মন্দির ছিল। এই সব মন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল মক্কার কাবা মন্দির। কাবা মন্দিরে অনেক দেবতার মূর্তি ছিল। বহু লোক সেখানে তীর্থ করতে যেত। কিন্তু আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বাইরের জগতের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে তাদের পুরনো বিশ্বাস ও ধর্মমতে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। ইয়েমেন ও হেজ্জাজে ইহুদীদের ধর্মমত খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কোন কোন স্থানে খ্রীষ্টধর্ম এবং জরাথুস্ত্রের ধর্মও আরবদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয় পাঠ

ইসলামধর্ম প্রবর্তক হজরত মোহম্মদ

আরবের এই সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার মধ্যে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা শহরে হজরত মোহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। মোহম্মদের পিতার নাম আবদুল্লা, মাতার নাম আমিনা। সম্ভবতঃ ছেলেবেলায় মোহম্মদ লেখাপড়া শেখার কোন সুযোগ পান নি। খুব অল্প বয়সেই তিনি খাদিজা নামে এক ধনী বিধবার অধীনে উট-চালকের চাকরি করতে শুরু করেন। চাকরি করার সময় সম্ভবতঃ তিনি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি স্থানে যান এবং এই সময়ই ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মমতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এই দুই ধর্মমতেরই মূল কথা— ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। এই দুই ধর্মমতের মূলকথা মোহম্মদের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। মোহম্মদ ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়—এই মতের উপর ভিত্তি করে আরবদেশে একটি নতুন ধর্ম প্রচারের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন যে, একজন উট-চালককে কেউ কখনও একজন ধর্মপ্রবর্তক বলে স্বীকার করতে রাজী হবে না। সুতরাং তিনি খাদিজা বেগমকে বিয়ে করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি নিজেকে ঈশ্বর বা আল্লার প্রেরিত একমাত্র ধর্মপ্রচারক বলে ঘোষণা করেন। বহু দেবতার পূজার পরিবর্তে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাই তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূলকথা। তাঁর প্রচারিত এই নতুন ধর্ম ইসলাম বা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের ধর্ম নামে পরিচিত। মোহম্মদের স্ত্রী খাদিজা, পোষ্যপুত্র আলি, বন্ধু আবুবকর এবং জেইদ নামে একজন ক্রীতদাস সর্বপ্রথম ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন।

কিন্তু প্রচলিত ধর্মের পরিবর্তে মোহম্মদ এই নতুন ধর্মমত প্রচার করতে শুরু করলে মক্কার লোকেরা তাঁর বিরোধী হয়ে ওঠে। মোহম্মদের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রও শুরু করে। প্রাণরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে রাত্রির অন্ধকারে আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান। মোহম্মদের মক্কা ছেড়ে মদিনায় পালাবার ঘটনা হিজিরা নামে পরিচিত। এই বছর থেকেই হিজিরা অব্দ গণনা করা হয়।

মদিনার লোকেরা সাদরে হজরত মোহম্মদকে গ্রহণ করে। সাত বছরের চেষ্টার ফলে মদিনার প্রায় সমস্ত লোকই ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদ তাঁর মদিনার অনুচরদের নিয়ে মক্কায় এসে উপস্থিত হন। মক্কার লোকেরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মোহম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিছু দিনের মধ্যে সমস্ত আরবদেশ ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মোহম্মদের মৃত্যু হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা মুসলমান নামে পরিচিত।

মোহম্মদের ধর্মমত : মোহম্মদ কখনও নিজেকে ঈশ্বরের অবতার বলে প্রচার করেননি। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের বা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন। ইসলামধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কোরাণে মোহম্মদের ধর্মমত এবং উপদেশ সংকলিত রয়েছে। আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে কোরাণই সবচেয়ে জনপ্রিয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ কোরাণকে অভ্রান্ত বলে মনে করেন। কোরাণের মূল কথা ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। মোহম্মদই একমাত্র ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্মপ্রচারক। পিতামাতার প্রতি ভক্তি, প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ব্যবহার, দুঃস্থদের প্রতি করুণা, সকলের প্রতি ন্যায়বিচার, সৎকাজে স্বর্গবাস এবং অসৎ কাজে নরকবাস প্রভৃতি ইসলামধর্মের অন্যান্য মতবাদ। খ্রীষ্টধর্মের মত ইসলামধর্মও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর প্রত্যেকে বিচারের জন্য ঈশ্বরের দরবারে উপস্থিত হবে এবং পাপ-পুণ্যের ফল তারা ভোগ করতে বাধ্য হবে।

ইসলামধর্ম বিস্তারের কারণ : ইসলামধর্ম সহজ, সরল ও আড়ম্বরহীন ; ফলে আরবের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অতি সহজেই ইসলামধর্ম বিস্তারের সুযোগ লাভ করে। পুরোহিতের অত্যাচার

যা শাস্ত্রের অনুশাসনের বাড়াবাড়ি এই ধর্মে নেই। সারাদিনের মধ্যে পাঁচবার মক্কার দিকে মুখ করে ধর্মগ্রন্থ কোরাণ থেকে কিছু অংশ পাঠ করলেই ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়। তাছাড়া জীবনে কয়েকটি সাধারণ রীতি মেনে চলাই হল ইসলামধর্মের মূল কথা। স্বাভাবিক ভাবেই এই ধর্ম সকলের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

মোহম্মদ প্রচার করেন যে, যারা ইসলামধর্মের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করবে, তারা সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হবে। সুতরাং মৃত্যুর পরে আল্লাহ্‌র দরবারে শেষ বিচারের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা না করে অনেকেই তাড়াতাড়ি স্বর্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। পবিত্র কোরাণে বর্ণিত আছে—স্বর্গ সকল প্রকার সুখের স্থান। সেজন্য মুসলমান যোদ্ধাগণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হত। ফলে প্রতিটি যুদ্ধেই তারা প্রায় জয়লাভ করত এবং পরাজিত জাতিকে হয় মৃত্যুবরণ বা ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করত। পরাজিত জাতিরা প্রাণরক্ষার জন্য ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হত। ফলে অতি সহজেই ইসলামধর্ম বিভিন্ন স্থানে প্রসার লাভ করে।

তৃতীয় পাঠ

খলিফাগণ ঃ আরব সাম্রাজ্য ঃ কর্ডোভা ঃ

মোহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলাম সাম্রাজ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন আবুবকর। মোহম্মদের পোষ্যপুত্র ও জামাতা আলিও নেতৃত্বের জন্য আবুবকরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেন। কিন্তু আবুবকরই আলির তুলনায় এই পদের জন্য অনেক বেশি যোগ্য ছিলেন এবং তাঁর সমর্থক-সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি। সুতরাং তখনকার মত আলির সমর্থকরা যুদ্ধে হেরে যায়। আবুবকর দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি খলিফা বা উত্তরাধিকারী উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে সিরিয়ার উপর খলিফার কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। সিরিয়ার সমস্ত

অধিবাসীকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আবুবকরের মৃত্যু হয়।

আবুবকরের পর খলিফার পদ গ্রহণ করেন ওমর। তিনি খলিফার আসন গ্রহণ করার পর মাত্র দশবছরের মধ্যে পারস্য (পার্শিয়া), মিশর, ফিনিসিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চল দখল করেন। তিনিই দামাস্কাসে প্রথম ইসলাম সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। ওমরের মৃত্যুর পর খলিফা হন ওসমান। তিনি নিহত হলে খলিফার পদ পান মোহম্মদের পোষ্যপুত্র ও জামাতা আলি। এই সময় ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং আলি শত্রুর হাতে নিহত হন। আলির মৃত্যুর পর খলিফার পদ বংশানুক্রমিক হয়; তাছাড়া এতদিন পর্যন্ত খলিফারা ছিলেন ইসলাম ধর্মজগতের কেবলমাত্র প্রধান গুরু; এখন থেকে খলিফারা হলেন বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। খলিফার পদ নিয়েও নানারকম ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এই সময়ই দামাস্কাসের পরিবর্তে ইসলাম সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী গড়ে ওঠে টাইগ্রিস নদীর তীরে বাগদাদে। বাগদাদে খলিফাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন হারুন-অল-রসিদ।

খলিফার পদ নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র দেখা দিলেও আরব সাম্রাজ্যের অগ্রগতি কিন্তু বন্ধ হয়নি। ইতিমধ্যেই আরব সাম্রাজ্য ভারতের সীমানা থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বাগদাদ থেকে একজন খলিফার পক্ষে এত বড় সাম্রাজ্য শাসন করা সম্ভব ছিল না। ফলে মিশরের কায়রো ও স্পেনের কর্ডোভায় আরও দু'জন খলিফার উদ্ভব হয়। ধর্মের ব্যাপারে বাগদাদের খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে নিলেও, কায়রো ও কর্ডোভায় খলিফাগণ স্বাধীনভাবেই তাদের সাম্রাজ্য শাসন করতেন।

৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আব্দ্-অর্-রহমানের নেতৃত্বে মুসলমানরা স্পেন অধিকার করে। কর্ডোভায় তাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কর্ডোভা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-ভাস্কর্যে একটি খুব উন্নত কেন্দ্রে পরিণত হয়। কর্ডোভার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সকলের প্রশংসা

অর্জন করে। তবে শিক্ষাকেন্দ্ররূপেই কর্ডোভার সুনাম সবচেয়ে বেশি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক ছাত্র কর্ডোভায়
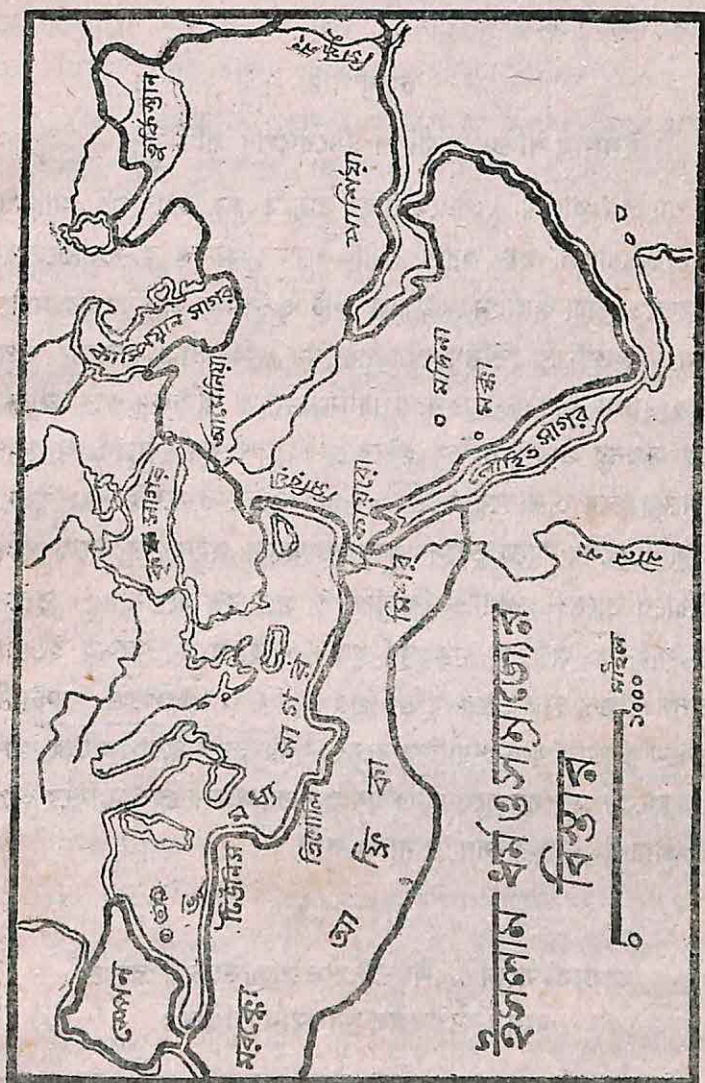
পড়াশুনা করতে আসত। অক্সফোর্ড, প্যারী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্রীষ্টান ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন গারবার্ট।

তিনি পরে রোমের পোপ হন। তখন তাঁর নাম হয় দ্বিতীয় সিলভেস্টার। ইউরোপে বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র প্রসারের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করেন।

চতুর্থ পাঠ

ইসলাম শক্তির জাগরণে ইউরোপের প্রতিক্রিয়া

পারস্য (পার্শিয়া), প্যালেস্টাইন প্রভৃতি জয় করার পর আরবগণ কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করতে তাঁরা ব্যর্থ হন ; উপরন্তু ক্রীট ও সিসিল দ্বীপ তাদের অধীনে আসে। অন্যদিকে ভিসিগথদের পরাজিত করে তারা স্পেনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে ; তারপর পিরানিজ পর্বত অতিক্রম করে ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হয়। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো আরব আক্রমণ-কারীদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস মর্টেলের কাছে তুরসের যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের ফলে দক্ষিণ ইউরোপে তাদের অগ্রগতি কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তুরসের যুদ্ধ পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলেই ইউরোপ ইসলাম শক্তির হাত থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কনস্ট্যান্টি-নোপলে তুরসের যুদ্ধে পরাজিত হয়েই আরবগণ ইউরোপ জয়ের আশা ত্যাগ করে। তুরসের যুদ্ধের পর মুসলমানরা আবার স্পেনে ফিরে আসে এবং প্রায় ৭০০ বছর সেখানে রাজত্ব করে।

পঞ্চম পাঠ

সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্প-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে আরবের দান ঃ কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিত ঃ

ইসলামধর্মের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আরবের জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। আরবের সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার পর এই পরিবর্তন আরও গভীরভাবে দেখা দেয়। মিশর, সিরিয়া, পারস্য (পার্শিয়া), মেসোপটেমিয়া, এশিয়া-মাইনর প্রভৃতি সুসভ্য অঞ্চল

আরবের অধীনে আসে। এইসব দেশের সভ্যতার সঙ্গে মিলেমিশে অল্পদিনের মধ্যে আরবের লোকেরা খুব উন্নতি লাভ করে। ভারত ও চীনের সভ্যতার অনেক কিছু তারা গ্রহণ করে। খলিফাদের উৎসাহের ফলে ইসলাম সাম্রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গড়ে-ওঠা আরবের সভ্যতা মধ্যযুগের সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ছিল।

চীনের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে আরবের লোকেরা কাগজের ব্যবহার শেখে। বাগদাদ থেকে কাগজ মিশর, মরক্কো, স্পেন হয়ে সিসিলিতে পৌঁছায়। তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কাঁচশিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। সিরিয়া ছিল কাঁচশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। নানা রং-এর টালি, ইট, মোজেক ও বিভিন্ন ধাতুর বাসন-কোসন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তৈরি হত। বয়নশিল্পও যথেষ্ট উন্নত ছিল। তুলা ও পশমের নানারকম শৌখিন জিনিস তৈরির জন্য পারস্য (পার্শিয়া) ও বোখারার খুব সুনাম ছিল। মূল্যবান ধাতুর অলঙ্কার নির্মাণেও তারা খুব দক্ষ ছিল। আরবদের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্পও উন্নত ছিল। মসজিদ ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণে শিল্পীদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রীস ও রোমের বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই আরবের লোকেরা প্রথম বিজ্ঞানের আলোচনা শুরু করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা নতুন নতুন আবিষ্কার শুরু করে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হুনিয়ান, ইবন্-ইমাদ, আলি-অল্-তাবারী ও রাজেসের নাম উল্লেখ-যোগ্য। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে ইদ্রিসি ও অল্-খোয়ার-জামি খুব কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বীজগণিত ও গণিত-শাস্ত্রেও প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল। সম্ভবতঃ ভারতের কাছ থেকেই আরবের লোকেরা সংখ্যা ও শূন্যের ব্যবহার শেখে।

আরবের দর্শনে গ্রীক ও হিন্দু পণ্ডিতদের গভীর প্রভাব দেখা যায়। আরবের দার্শনিক অল্-ফিনদি প্লেটোর ভক্ত ছিলেন। আরবের আর একজন দার্শনিক ছিলেন অ্যাভেরোয়েস। তিনি সেখানে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর জীবনের আদর্শ ছিলেন অ্যারিস্টোটল।

শিক্ষার উপরে আরবের লোকেরা খুব গুরুত্ব দিত। আরবী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হত। সব ছাত্র-ছাত্রীকেই কোরাণ পড়তে হত।

উচ্চশিক্ষারও কয়েকটি কেন্দ্র ছিল। এই কেন্দ্রগুলোর মধ্যে খলিফা মামুদের প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের "জ্ঞানের আলয়" খুব বিখ্যাত। কায়রো ও কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় দু'টিও খুব বিখ্যাত ছিল। বাগদাদ, দামাস্কাস, কায়রো, কর্ডোভা প্রভৃতি বড় বড় শহরে অনেক গ্রন্থাগারও ছিল।

মধ্যযুগের ইতিহাসে আরবের সভ্যতা বাইজ্যাণ্টাইন সভ্যতা অপেক্ষাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাইজ্যাণ্টাইন সভ্যতার চেয়ে আরবের সভ্যতা গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেক বেশি আত্মসাৎ করে এবং বিভিন্ন দেশে এই সভ্যতা বিস্তারের ব্যাপারে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। তাছাড়া নতুন নতুন সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সৃষ্টির ব্যাপারেও আরবের লোকেদের দক্ষতা বাই-জ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি।

আরবদেশের কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি—আরব দেশের এই যুগের পণ্ডিতদের মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী অল্‌রাজী আবিসেন্না, রসায়ন শাস্ত্রবিদ্ জাবীর, গণিত শাস্ত্রবিদ্ ওমর খৈয়াম, অল্‌হাজেন, কামালদিন প্রভৃতির নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা যায়।

অনুশীলনী

১। ইসলামধর্মের উত্থানের পূর্বে আরব দেশের ও সেখানকার জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

২। হজরত মোহম্মদের জীবনী সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৩। ইসলামধর্মের মূল কথা কি?

৪। ইসলামধর্ম বিস্তারের কারণ কি?

৫। খলিফাদের সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৬। ইসলাম শক্তির জাগরণে ইউরোপে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়?

৭। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আরবের দান সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৮। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) মোহম্মদ কেন মক্কা থেকে পালিয়ে যান?

(খ) হিজিরা কাকে বলে?

(গ) ইসলামধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কি? ইসলামধর্মের মূল কথা কি?

(ঘ) কর্ডোভা কোথায় ও কি জন্য বিখ্যাত?

(ঙ) তুরসের যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান?

৯। এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মোহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন?

(খ) কোন্ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মোহম্মদ মারা যান?

(গ) প্রথম খলিফার নাম লিখ।

(ঘ) ইসলাম সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রথম কোথায় স্থাপিত হয়?

(ঙ) স্পেনে কে ইসলাম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন?

(চ) একজন বিখ্যাত খলিফার নাম লিখ।

(ছ) কাদের কাছ থেকে মুসলমানেরা কাগজের ব্যবহার শেখে?

(জ) তুরসের যুদ্ধে মুসলমানেরা ইউরোপের কোন্ রাজার কাছে পরাজিত হয়?

১০। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(ক) উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলোর মধ্যে বাগদাদের — খুব বিখ্যাত।

(খ) — উপর আরবের লোকেরা খুব গুরুত্ব দিত।

(গ) সিরিয়া ছিল — প্রধান কেন্দ্র।

(ঘ) মোহম্মদের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন —।

(ঙ) — ও — এই দুই ধর্মের মূলকথা মোহম্মদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ

প্রথম পাঠ

শার্লামেন ঃ

জার্মান উপজাতি ফ্রাঙ্কদের রাজা পেপিনের মৃত্যুর পর তাঁর
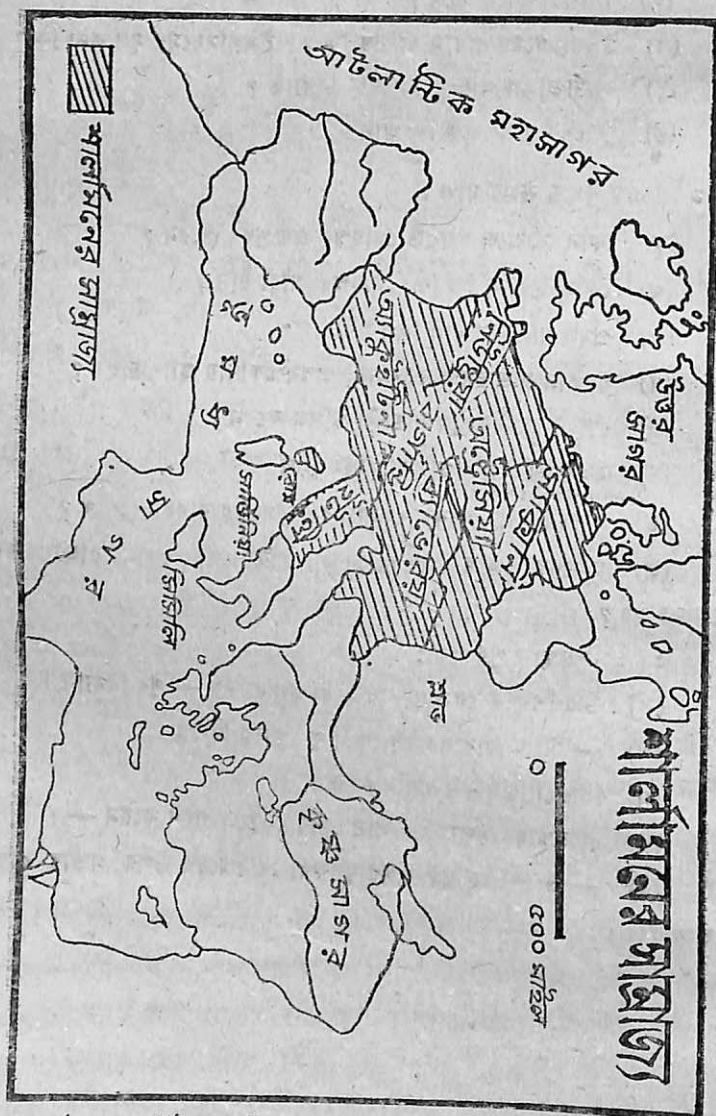
পুত্র চার্লস ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি কার্লাস ম্যাগনাস

অথবা শার্লামন নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। ইউরোপে মধ্যযুগের ইতিহাসে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনিই প্রথম প্রায় সমগ্র জার্মানী জয় করেন এবং সেখানে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন। খ্রীষ্টধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে তিনি সুনাম অর্জন করেন। চার্লসের রাজ্যের আয়তন বেশ বড় ছিল। রাইন নদী ও পিরানিজ পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানের বসবাসকারী সমস্ত ফ্রাঙ্করা তাঁর অধীনতা স্বীকার করে। ইটালীর লোম্বার্ডি ও পোপের রাজ্যও তাঁর অধিকারে আসে। বোহেমিয়া. স্যাক্সনি, ব্যাভেরিয়া, প্যানেলিয়া ও ফ্রিজিয়ার উপর তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। স্পেনেরও কিছু অংশ তিনি অধিকার করেন। এই সময় রোমের পোপ ছিলেন তৃতীয় লিও। ৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রোমের একদল লোক পোপের উপর খুব অত্যাচার শুরু করে। আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে সামরিক শক্তির সাহায্যের জন্য তিনি চার্লসের নিকট সংবাদ পাঠান। সংবাদ পেয়েই চার্লস্ রোমে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেন। পোপ তাদের সাহায্যে আবার তাঁর নিজের বাসস্থান ল্যাটেরান প্রাসাদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান। পরবর্তী বছরে বড়দিনের সময় রোমের সেণ্ট পিটার গীর্জায় উপাসনার জন্য চার্লস উপস্থিত হন। উপাসনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোপ তৃতীয় লিও চার্লসের মাথায় রোমের রাজ-মুকুট পরিয়ে দেন। পোপ তখন তাঁকে রোমের জনসাধারণের সম্রাট বলে সম্বোধন করেন এবং 'অগাস্টাস' উপাধিতে ভূষিত করেন। গীর্জায় উপস্থিত ব্যক্তিগণও হর্ষধ্বনি করে পোপের এই কাজ সমর্থন করেন। এতদিন পর্যন্ত চার্লস শুধু ফ্রাঙ্ক, লোম্বার্ড ও অন্যান্য জার্মান উপজাতিদের রাজা ছিলেন; এখন থেকে তিনি রোমান সম্রাটের মর্যাদাও লাভ করেন।

দ্বিতীয় পাঠ

চার্লসের অভিষেকের গুরুত্ব

পোপ তৃতীয় লিওর কাছ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে চার্লস রোম সাম্রাজ্যের রাজমুকুট লাভ করেন। তখনই তিনি সম্রাট এবং অগাস্টাস উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু এসব উপাধি পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর ক্ষমতা, সম্মান, প্রতিপত্তি এতটুকুও বাড়েনি। শুধু সম্রাটরূপে তিনি প্রজাদের কাছ থেকে নতুন একটি আনুগত্যের শপথ লাভের অধিকার পান। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটও তাঁর এই নতুন অধিকার স্বীকার করে নেন। কিন্তু অন্যদিকে চার্লসের এই অভিষেকের গুরুত্ব অনেক বেশি। রাজমুকুট লাভ করার ফলে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখন থেকে খ্রীষ্টান ধর্মজগতের প্রধান গুরু পোপের সম্মান রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে চলে যায়। উত্তর ইউরোপ আবার রোম সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সংগঠন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার এই প্রথম সূত্রপাত। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য ও তার রাজধানী রোম আবার তাদের পূর্ব গৌরব ফিরে পায়। তাছাড়া এতদিন পর্যন্ত রোমের সঙ্গে জার্মান উপজাতিদের যে সংগ্রাম চলছিল, তারও অবসান ঘটে। কিন্তু এই অভিষেকের ফলেই পোপ ও সম্রাটের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কয়েক বছরের মধ্যেই তা আবার তিক্ততায় পরিণত হয়। ক্ষমতার জন্যই ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে বার বার অশান্তি দেখা দেয়।

শার্লামেন

তৃতীয় পাঠ

রাষ্ট্র ও চার্চের সম্পর্ক

শার্লামেন মনে করতেন যে, নিজের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যই ঈশ্বর তাঁকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছেন। বিশেষতঃ পোপ লিওর কাছ থেকে রাজমুকুট পাওয়ার পর তাঁর এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের শাসননীতি ধর্মের অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাঁর শাসনতান্ত্রিক নির্দেশের মধ্যে রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে কোন পার্থক্য ছিল না। কারণ তিনি নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনকে রাজ্যশাসনের অংশ বলে মনে করতেন। সুতরাং তিনি একদল সুশিক্ষিত কর্মদক্ষ ও অনুগত যাজক নিযুক্ত করার দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। তিনি আশা করতেন এই সব যাজকদের সাহায্যে তিনি তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে পারবেন। তবে বাই-জ্যান্টিয়ান শাসকদের মত তিনিও নিজেকে চার্চের সর্বেসর্বা বলে মনে করতে শুরু করলেন। সুযোগ পেলেই চার্চের নিয়ম-শৃঙ্খলা, আচার-অনুষ্ঠান, শিক্ষা-রীতি-নীতি, চার্চের সংগঠন, অপরাধী যাজকদের শাস্তি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে নতুন-নীতি গ্রহণ ও প্রয়োজন অনুসারে কিছু নীতি পরিবর্তন করেন। কোন কোন বিষয়ে তিনি পোপকেও পরামর্শ দিতেন। প্রকৃতপক্ষে চার্লসের পরামর্শ অনুসারেই পোপ সব কাজ করতে বাধ্য হতেন। চার্চের পরিষদের অধিবেশনে চার্লস সভাপতির পদ গ্রহণ করতেন। চার্চের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনিই যাজকদের নিযুক্ত করতেন। যাজকগণ কিভাবে ধর্মপ্রচার করবেন অথবা প্রার্থনার সময় কি গান হবে—সে সম্পর্কেও তিনি নির্দেশ দিতেন। তবে চার্চগুলো যাতে কখনও টাকা-পয়সার অভাব বোধ না করে, সেদিকে তিনি খুব সতর্ক দৃষ্টি দিতেন। তাঁর এই কঠোর নীতির ফলে প্রথম দিকে চার্চগুলো খুব ভালভাবে পরিচালিত হত। কিন্তু কিছুদিন পরেই সেখানে নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে শুরু করে।

চার্চগুলো ও যাজকদের এভাবে শাসন করা সত্ত্বেও শার্লামন মাঝে মাঝে যাজকদের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হতেন। বিশেষতঃ যাজকদের জমি অধিকার করার নীতি তিনি মোটেও সমর্থন করতেন না। যাজকদের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি লোভ এবং ধর্মের নামে অধর্মের কাজ করা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। তবে যাজকদের এসব কাজ পছন্দ না করলেও উপযুক্ত রাজকর্মচারী নিযুক্ত করার জন্য এই যাজকদের উপরই তাঁর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হত। কারণ যাজকশ্রেণী ব্যতীত অন্য কোথাও শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোক পাওয়া অসম্ভব ছিল।

চতুর্থ পাঠ

শার্লামনের রাজসভা ঃ শিল্প ও সাহিত্যের কেন্দ্র

শার্লামন পড়তে পারলেও লিখতে জানতেন না। কিন্তু বিদ্বান-দের তিনি খুব পছন্দ করতেন। সে সময়ের বড় বড় পণ্ডিতদের তিনি তাঁর পার্মা শহরে অবস্থিত রাজসভায় আশ্রয় দিতেন। এই সব পণ্ডিতদের মধ্যে "লোম্বার্ডদের ইতিহাস"-এর লেখক পল এবং পণ্ডিত অ্যাঙ্গিলবার্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর রাজসভায় সবচেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন অ্যালকুইন। তখনকার খ্রীষ্টান জগতের সবচেয়ে বিখ্যাত ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কের বিদ্যালয়ে তিনি বিদ্যার্জন করেন। তারপর শার্লামনের আমন্ত্রণে তাঁর রাজসভায় যোগ দেন এবং রাজপ্রাসাদের স্কুলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শার্লা-মনের রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের প্রধান উপদেষ্টার পদও তিনি লাভ করেন। তারপর ৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালকুইন তুরসের মঠের প্রধান যাজকরূপে নিযুক্ত হন। ইটালীর পিসা শহরের বিখ্যাত দু'জন পণ্ডিত পিটার এবং পলিনাসও শার্লামনের রাজসভায় যোগ দেন।

চার্লসের যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কীর্তি আইনহার্ডের লেখা "চার্লসের জীবনী"। তাঁর লেখা পড়েই আমরা ইউরোপের মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ও সবচাইতে আকর্ষণীয় ব্যক্তির জীবনের

অনেক কথা জানতে পারি। আইনহার্ড প্রথম জীবনে চার্লসের রাজপ্রাসাদের ছাত্র ছিলেন। তারপর তিনি চার্লসের সভাসদ্, সঙ্গী, সেক্রেটারীরূপে অনেকদিন তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পান।

শার্লামন ছিলেন ফ্রাঙ্কদের ক্যারোলিঞ্জিয়ান বংশের অধিপতি, সেজন্য তাঁর যুগকে ক্যারোলিঞ্জিয়ান যুগও বলা হয়। শার্লামনের সুশাসনের ফলে দীর্ঘকাল পরে ইউরোপে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। ব্যবসা-বাণিজ্য আবার উন্নতি লাভ করে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। শার্লামন নিজেও ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অনুরাগী। তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টার জন্যই এই সময় শিক্ষা ও সভ্যতার জগতে উন্নতি দেখা দেয়। এই পরিবর্তনকে সাধারণভাবে ক্যারোলিঞ্জিয়ান নবজাগরণ বলা হয়। পুরানো দিনের সাহিত্যিকদের রচনা পাঠ করা ও ল্যাটিন ভাষা শেখার দিকে সে সময়ের লোকদের যথেষ্ট আগ্রহ দেখা দেয়। তবে নতুন নতুন কাব্য ও সাহিত্য রচনায় ক্যারোলিঞ্জিয়ান যুগের কৃতিত্ব খুবই সামান্য। পুরাতন গ্রন্থ ও পুঁথিপত্র রক্ষা করা এবং শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে বাঁচিয়ে রাখাই সে যুগের প্রধান কৃতিত্ব।

শার্লামন নিজে পড়তে ভালবাসতেন কবি ভার্জিল এবং হিপ্পোর অধিবাসী আগস্টাইনের রচনা। লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার জন্যই শার্লামন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি স্কুল স্থাপন করেন। সম্রাটের রাজপ্রাসাদেও একটি স্কুল স্থাপিত হয়। এইসব স্কুলের ছাত্ররাই পরবর্তীকালে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় মঠগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করে। শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতির জন্য শার্লামন ইটালী, স্পেন, আয়াল্যাণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে নিজের দেশে নিয়ে আসেন। এইসব পণ্ডিতদের চেষ্টায় এবং শার্লামনের সাহায্যে ক্যারোলিঞ্জিয়ান যুগে যে নবজাগরণের সূচনা হয়, তার ফলে পরবর্তীকালে ফ্রান্স দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের আলোচনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। মধ্যযুগের অন্যতম

প্রধান পণ্ডিত ও লেখক বিড ক্যারোলিঞ্জিয়ান নবজাগরণের লোক ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের নর্দাম্ব্রিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জারোর মঠে তিনি সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেন। সাধু-সন্তদের জীবনী নিয়ে তিনি অনেক বই লেখেন। তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে 'ইংরেজদের চার্চের ইতিহাস' সবচেয়ে বিখ্যাত।

পঞ্চম পাঠ

ধর্মীয় মঠ : সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী : ধর্মীয় মঠের জীবন

খ্রীষ্টানদের চার্চে খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী নানারকম বিলাসিতা ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে শুরু করে। ফলে একদল যাজক এইসব রীতি-নীতির বিরোধিতা করে। কিন্তু তাঁরা এই ব্যবস্থার প্রতিকার করার কোন উপায় খুঁজে বার করতে অসমর্থ হন। সম্ভবতঃ তখন তাঁরা মিশর, ভারত প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের সন্ন্যাসীদের অনুকরণে নির্জনে বাস এবং মুক্তিলাভের চেষ্টা করা, সৎকাজে জীবন ব্যয় করার সংকল্প করেন। তাঁদের এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য অনেকে আলাদা আলাদা মঠ তৈরি করে বাস করতে শুরু করেন। এইভাবেই ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে মঠ ও বিভিন্ন শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের উৎপত্তি হয়।
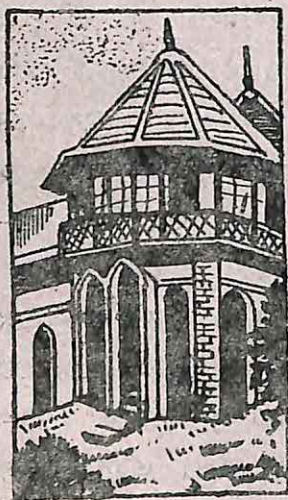
ধর্মীয় মঠ

তুর শহরে বিশপ সেণ্ট মার্টিন তুর শহরের কাছে মারমাউটিয়ারে ইউরোপের মাটিতে সর্বপ্রথম সন্ন্যাসীদের মঠ তৈরি করেন। প্রায় আশিজন সন্ন্যাসী সেখানে বাস করতেন। কিছুদিন পরে সেণ্ট ভিক্টর মার্সাই শহরের কাছে আর একটি মঠ তৈরি করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মঠের সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে অনেক আইন-কানুন রচনা করেন।

তারপর ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে অনেক মঠ গড়ে ওঠে। সন্ন্যাসিনী-দের জন্যেও অনেক মঠ তৈরি হয়। তবে খ্রীষ্ট-সন্ন্যাসীদের মঠের মধ্যে সেণ্ট বেনিডিক্টের মঠ, ক্যাসিনো এবং বার্গাণ্ডির ক্লুনির মঠ খুবই বিখ্যাত।

সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মুক্তির কথা চিন্তা করা। তাঁদের প্রধান কর্তব্য ছিল ভগবানের গুণগান করা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী ও সন্ন্যা-সিনীদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দেওয়া। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়, তাদের ঘুম থেকে উঠতে হত। তারপর খুব ভোরে সূর্যোদয়ের সময় সকাল আটটার পরে, দুপুরে সূর্যাস্তের সময় ও শুতে যাওয়ার আগে ঈশ্বরের কাছে তাঁদের প্রার্থনা করতে হত। বাকি সময় পড়াশুনা, ঈশ্বরের ধ্যান এবং পরিশ্রমের কাজ করে কাটত। সন্ন্যাসীদের নিকট আলস্য ছিল আত্মার সবচেয়ে বড় শত্রু। শীতকালে তাঁদের একবার এবং গরমের সময় তাঁদের দু'বার নিরামিষ খাবার খেতে দেওয়া হত। তবে সন্ন্যাসীদের শারীরিক পরিশ্রমও অনেক বেশি করতে হত। মধ্যে খেলাধূলা বা আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা ছিল না। একই শয়নাগারে —তবে আলাদা বিছানায় তাদের শুতে হত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাদের কোন পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হত না। কোন সন্ন্যাসীরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না।

মধ্যযুগের সন্ন্যাসী

কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও সন্ন্যাসিনীদেরও প্রায় সন্ন্যাসীদের মধ্যে একই জীবন-যাপন করতে হত।

ইটালীর রোম ও নেপলেস্ শহরের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত মন্তে ক্যাসিনো মঠের প্রতিষ্ঠাতা সেণ্ট বেনিডিক্ট সন্ন্যাসীদের জীবনে কঠোর নিয়ম পালন করার নীতির কিছু পরিবর্তন করেন। তবে সন্ন্যাসীদের সংযম ধৈর্যের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই নীতিই অন্যান্য মঠ গ্রহণ করে। বেনিডিক্টেরর নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক সন্ন্যাসীকেই নিয়ম মেনে চলার জন্য মঠের প্রধানের কাছে শপথ গ্রহণ করতে হত। এই শপথকে বেনিডিক্টের শপথ বলা হয়। কোন সন্ন্যাসী নিয়মকানুন লঙ্ঘন করলে মঠের প্রধান সন্ন্যাসী তাঁকে কঠোর শাস্তি দিতে পারতেন।

দুর্ধর্ষ জার্মান উপজাতিদের বর্বরতা দূর করে শিক্ষিত ও সভ্য করে তোলার ব্যাপারে বেনিডিক্টের মঠের দান অপরিসীম। বেনিডিক্টের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু লোক তাঁর মঠে যোগ দেন। বেনিডিক্টের মঠের সন্ন্যাসীদের প্রভাবে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রায় ও সমাজ-জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। সহজ ও সরলভাবে জীবন-যাপনের দিকে তারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে ওঠে।

ষষ্ঠ পাঠ

শিক্ষা বিস্তারে মঠের দান

প্রথম দিকে ধর্মীর মঠগুলোকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করার ইচ্ছা সেণ্ট বেনিডিক্টের ছিল না। কিন্তু সন্ন্যাসীরা যাতে লেখাপড়া শিখে ধর্মশাস্ত্র পড়তে পারে, তিনি তার ব্যবস্থা করেন। লেখাপড়া শেখা লোকেদের তিনি সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করার সুযোগ দিতেন। ক্যাসিওডোরাস নামে একজন সন্ন্যাসীই মঠগুলোকে শিক্ষার এবং প্রাচীন সাহিত্য রক্ষাবেক্ষণ প্রচারের কেন্দ্রে পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করেন। প্রথম জীবনে ক্যাসিওডোরাস অস্ট্রোগথদের রাজা থিওডোরিকের অধীনে চাকুরি করতেন। পরে তিনি প্রাচীন যুগের ও

খ্রীষ্টান ধর্মের সাহিত্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও নকল করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই কাজে বহু সংখ্যক সন্ন্যাসী তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ইটালী ও উত্তর আফ্রিকা থেকে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় হাতে-লেখা বহু বই তিনি উদ্ধার করেন। তিনি এইসব বই সুন্দরভাবে নকল করার ব্যবস্থা করেন। ক্যাসিওডোরাস ও তাঁর সন্ন্যাসীরা এইভাবে প্রাচীনকালের বহু গ্রন্থ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। অন্যান্য মঠের সন্ন্যাসীরা বিশেষতঃ বেনিডিক্টের শিষ্যরাও তাকে অনুকরণ করতে শুরু করেন। তাছাড়া বিশপদের অধীনে স্কুলগুলো ব্যতীত আর বাকি সব স্কুলের পরিচালনার দায়িত্বও মঠের সন্ন্যাসীরা গ্রহণ করেন।

সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত বিজ্ঞান, চিকিৎসা-শাস্ত্র, কারিগরী শিক্ষা, সঙ্গীত-শাস্ত্র, সূচীশিল্প প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই সন্ন্যাসীরা খুব দক্ষ ছিলেন। সাধারণ লোকেরা তাদের কাছ থেকে এই সব শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত।

ক্লুনি—৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বার্গাণ্ডিতে ক্লুনির মঠ স্থাপিত হয়। ক্লুনির মঠ সরাসরি পোপের অধীনে ছিল। বিশপ বা মঠের সন্ন্যাসীদের এই মঠের উপর কোন অধিকার ছিল না। সামন্ত প্রথার কোন আইন-কানুন অথবা বাধা-নিষেধ মেনে চলার দায়িত্বও এই মঠের ছিল না। সুতরাং রাষ্ট্র ও চার্চের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে এই মঠ গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ক্লুনির অধীনে আরও কয়েকটি মঠ গড়ে ওঠে।

সেণ্ট বেনিডিক্টের নির্দেশ অনুসারে ধর্মসংস্কার করাই ছিল ক্লুনির মঠের একমাত্র উদ্দেশ্য। তবে মঠের সন্ন্যাসীর জীবনে শারীরিক পরিশ্রম অপেক্ষা ঈশ্বরের ধ্যান ও নিজের মুক্তির চিন্তাকেই বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হত। সন্ন্যাসীদের কৌমার্য, শাস্ত্রের আইন হুবহু অনুকরণ, সততা ও নির্বাচনের দ্বারা প্রধান সন্ন্যাসী স্থির করার দিকে তাঁরা বেশি গুরুত্ব দিতেন। তবে মঠের সম্পত্তি ঠিকভাবে

রক্ষা করা এবং সম্পত্তি বাড়িয়ে তোলার দিকেও তাদের যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

ক্লুনির সংস্কারের ফলে অনেক রাজ্যেই বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। জার্মানীর গ্রামের দিকের যাজকরা সাধারণতঃ বিয়ে করত। জার্মানীতে চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যাজকরা সাধারণতঃ দেশের শাসকের দ্বারাই নির্বাচিত হত। ক্লুনির সন্ন্যাসীরা যাজকদের বিবাহ ও রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল চার্চ—এই দু'টোকেই ধর্মশাস্ত্র বিরোধী কাজ বলে মনে করত। পোপ সপ্তম গ্রেগরী ক্লুনির সংস্কারকে সমগ্র খ্রীষ্টান জগতে প্রচার করার চেষ্টা করেন। ফলে এই ধর্মের সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পোপের সঙ্গে সম্রাটের দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে তীব্র হয়ে ওঠে।

সপ্তম পাঠ
অভিষেকের সংঘর্ষ

যাজকদের বিবাহ, ধর্মশাস্ত্র লঙ্ঘন ও শাসকদের দ্বারা যাজকদের অভিষেক ধীরে ধীরে চার্চ ও ধর্মের প্রধান শত্রুরূপে দেখা দেয়। যাজকদের দুর্বলতার সুযোগে সেখানে নানারকম দূর্নীতিও প্রবেশ করে। ক্লুনির সংস্কারের মূল কথা ছিল—ধর্মজীবন থেকে এগুলো দূর করা। ১০৭৩ খ্রীঃ থেকে ১০৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমের পোপ ছিলেন সপ্তম গ্রেগরী। তখন জার্মানীর সম্রাট ছিলেন চতুর্থ হেনরী। গ্রেগরী ক্লুনির সংস্কার কার্যকরী করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। অপরদিকে সম্রাট চতুর্থ হেনরী অর্থের বিনিময়ে যাজক নিযুক্ত করা, যাজকদের নির্বাচনে রাজার প্রভাব কাজে পরিণত করা এবং যাজকদের অভিষিক্ত করাকে রাজার অধিকার বলে মনে করতেন। ফলে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। গ্রেগরীর মতে—ঈশ্বর মানুষের জন্য দু'টি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন—একটি চার্চ, অপরটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্র শুধু মানুষের ইহ-জীবনের অধিকারী ; অপরদিকে মানুষের চিরকালের মঙ্গলের দায়িত্ব চার্চের। সুতরাং রাষ্ট্র অপেক্ষা চার্চের ক্ষমতা

অনেক বেশি। ধর্ম-জগতের প্রধানরূপে পোপও সেই ক্ষমতার অধিকারী।

যাজকদের অভিষেককে কেন্দ্র করে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে দ্বন্দ্ব বহুদিন চলতে থাকে। উভয়েরই পক্ষে ও বিপক্ষে বহু তর্ক ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগের ইতিহাসে তার গুরুত্বও যথেষ্ট। পোপ সপ্তম গ্রেগরী ও সম্রাট চতুর্থ হেনরীর মৃত্যুই এই সমস্যার সমাধান করে। ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম হেনরী পোপ দ্বিতীয় ক্যালিক্সটাসের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন। এই চুক্তি অনুসারে সম্রাট যাজকদের অভিষেক করার ক্ষমতা ও যাজকদের পদ বিক্রির অধিকার ত্যাগ করেন। তবে তিনি যাজকদের নির্বাচনে উপস্থিত থাকার ক্ষমতাকে ত্যাগ করতে রাজী হন নি। পোপও সম্রাটের এই দাবি স্বীকার করেন। এই চুক্তি অনুসারে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে দ্বন্দ্ব শেষ হলেও চার্চের দুর্নীতি দমন করা পোপের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

অষ্টম পাঠ

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী : মঠ ও চার্চের স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন : কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত : ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্ক

মধ্যযুগের প্রথম দিকে মঠ ও বিশপদের অধীনে ক্যাথিড্রাল স্কুলগুলোই ছিল শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র। কিন্তু গ্রীসের বিজ্ঞান, দর্শন ও রোমের আইন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে, শিক্ষাজগতে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। অপরদিকে চার্চের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার জন্য শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ আইনবিদের প্রয়োজন ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে শুরু করে। প্যারিস্, বোল্গনা, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্রাগ, ভিয়েনা, লোভেন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইভাবেই পত্তন হয়। মধ্যযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার আর একটি প্রধান কারণ।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্ঘ ছিল। শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষক ও ছাত্ররা সেখানে উপস্থিত হত। চিকিৎসা বিজ্ঞান, আইন ও ধর্মশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপককে ডীন বলা হত। সাহিত্য, দর্শন, তর্কবিজ্ঞান প্রভৃতি কলা বিষয়ের প্রধান অধ্যাপককে রেক্টর বলা হত। চিকিৎসা বিজ্ঞানে আইন ও ধর্মশাস্ত্রের গুরুত্ব বেশি থাকলেও, কলা বিষয়ের ছাত্রের সংখ্যা থাকত অনেক বেশি। শিক্ষকরা ছাত্রদের বই পড়ে শোনাতেন। বইয়ের সংখ্যা খুবই কম ছিল এবং বইগুলি ধৈর্যের সঙ্গে নকল করা হত। ছাত্ররা শিক্ষকদের বই পড়া শুনে মনে রাখার চেষ্টা করত, তারপর প্রস্তুত হয়ে পরীক্ষা দিতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষার জন্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে হত। সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করার পর অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হতেন। মধ্যযুগের পণ্ডিতদের মধ্যে পিয়ের অ্যাবেলার্ড, রবার্ট দ্য সর্বোঁ, গ্রেটিয়ান, আর্নালডাস ভিলানোভানাস, রেমণ্ড লুলি, সেণ্ট এন্সেলম প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

পিয়ের অ্যাবেলার্ড ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ব্রিটানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে প্যারিসের ক্যাথিড্রাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি নিজেই প্যারিসের কাছে মেলুনে একটি স্কুল স্থাপন করেন। তিনি নির্ভীক ছিলেন। মধ্যযুগের শিক্ষা ও জ্ঞান জগতের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। তাঁর লেখা দু'খানা বিখ্যাত বই, 'হ্যাঁ ও না', এবং 'আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী'। ১১৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। অ্যাবেলার্ড ছাত্রদের কাছে খুব প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সূত্রপাত।

রবার্ট দ্য সর্বোঁ সেণ্ট লুই মঠের যাজক ছিলেন। তিনি ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে হাউস অফ সর্বোঁ নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখানে ছাত্রদের জন্য আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হত।

অল্পদিনের মধ্যেই হাউস অফ সর্বোঁ খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ে।

গ্রেটিয়ান ধর্ম সম্পর্কিত আইনের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বোলগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। রোমের আইনের অনুকরণে তিনি চার্চের বিভিন্ন আইন ও রীতি-নীতি সঙ্কলন করেন। 'পরস্পর বিরোধী আইনের সামঞ্জস্য' তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ। খ্রীষ্টান জগতের সমস্ত যাজকদেরই এই বইটি পাঠ করতে হত।

আর্নালডাস ভিলানোভোনাস এবং রেমণ্ড লুলি উভয়ই বোলগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রেও তাঁদের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ছাত্রদের কাছেও স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য আর্নালডাস ভিলানোভানাস ও রেমণ্ড লুলি প্রচুর সুনাম অর্জন করেন।

সেণ্ট এন্সেলম একাদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। ১০৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নর্ম্যাণ্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নর্ম্যাণ্ডির বেকের মঠের সন্ন্যাসী। পরে তিনি ইংল্যাণ্ডের ক্যাণ্টারবারির গীর্জার আর্চ বিশপের পদ লাভ করেন। চার্চের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় উইলিয়মের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তিনি দর্শনশাস্ত্রের উপর কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। এইসব গ্রন্থের মধ্যে—'ঈশ্বর কেন মানুষ হলেন' সবচেয়ে বিখ্যাত।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরজীবন বর্তমান কালের ছাত্রদের মত শৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল না। কিন্তু তাদের ছাত্রজীবন ছিল আরও দীর্ঘ। ছাত্ররা সাধারণতঃ যে যেখানে পারে, বাসস্থান সংগ্রহ করে নিত। তবে ছাত্রদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত হোস্টেলে বাস করত। সাধারণতঃ তাদের চার বা পাঁচজনকে এক ঘরে বাস করতে হত। শিক্ষক ও ছাত্ররা একসঙ্গে বসবাস, আলাপ আলোচনা প্রভৃতি করতে বাধ্য ছিল বলে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠত।

তেরো থেকে ষোল বছরের মধ্যেই সাধারণতঃ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হত। কিন্তু শিক্ষকদের সংখ্যা অল্প থাকত বলে তাদের পক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হত না। অনেক ছাত্র পড়াশুনা না করে, খেলাধূলা, ঝগড়া, মারামারি করেই সময় কাটিয়ে দিত। পরে ঐসব অল্পবয়সী ছাত্রদের জন্য কলেজ গড়ে উঠতে থাকে। এই কলেজগুলোর মধ্যে প্যারিসের রবার্ট দ্যঁ সর্বোঁর কলেজ সবচেয়ে বিখ্যাত।

অনুশীলনী

১। শার্লামন সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

২। কিভাবে শার্লামন রোমের সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হন ?

৩। চার্লসের অভিষেকের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। শার্লামনের সম্রাট পদে অভিষেকের ফলে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে কি রূপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে ?

৫। শার্লামন কিভাবে চার্চকে নিজের অধীনে রাখতে চেষ্টা করেন ?

৬। শার্লামনের রাজসভা সম্বন্ধে কি জান ?

৭। ক্যারোলিঞ্জিয়ান নবজাগরণ কি ? এই যুগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। মধ্যযুগের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জীবন সম্পর্কে কি জান ?

৯। মধ্যযুগের শিক্ষাবিস্তারে মঠের দান সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

১০। ক্লুনির মঠের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১১। অভিষেকের সংঘর্ষ বলতে কি বুঝায় ? কিভাবে অভিষেক সংঘর্ষের অবসান ঘটে ?

১২। মধ্যযুগে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে ? মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে পরিচালিত হত ?

১৩। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জীবন কিরূপ ছিল ?

১৪। নিম্নলিখিত পণ্ডিতদের সম্পর্কে কি জান ?

(ক) পিয়ের অ্যাবেলার্ড ; (খ) রবার্ট দ্য সর্বো ; (গ) গ্রেটিয়ান ; (ঘ) সেন্ট এন্সেলম ; (ঘ) এগিন হার্ড ; (চ) অ্যালকুইন।

১৫। সংক্ষেপে উত্তর দাও :—

(ক) তুরের যুদ্ধ কিভাবে ইয়োরোপকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করে ?

(খ) শার্লামেনের সময় রোমের পোপ কে ছিলেন ? কেন তিনি শার্লামেনের সাহায্য প্রার্থনা করেন ?

(গ) কোন্ বছরের কোন্ তারিখে শার্লামেন রোমের সম্রাট হন ? রোমের সম্রাট হওয়ার পর তার ক্ষমতার কি পরিবর্তন হয় ?

(ঘ) সেন্ট বেনিডিক্ট সম্বন্ধে কি জান ?

(ঙ) মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল ? মঠে তাঁদের কি কি কাজ করতে হত ?

১৬। এক কথায় উত্তর দাও :—

(ক) 'চার্লসের জীবনী' কে রচনা করেন ?

(খ) 'লোম্বার্ডদের ইতিহাস' কার রচনা ?

(গ) ইয়োরোপের সর্বপ্রথম ধর্মীয় মঠ কে স্থাপন করেন ?

(ঘ) মন্তে ক্যাসিনো মঠটি কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

(ঙ) 'আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী' কে রচনা করেন ?

১৭। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) — একাদশ শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন।

(খ) শার্লামেনের সময় রোমের পোপ ছিলেন —।

(গ) ইটালীর পিসা শহরের বিখ্যাত দু'জন পণ্ডিত — এবং — চার্লসের রাজসভায় আশ্রয় পান।

(ঘ) — খ্রীষ্টাব্দে বার্গাণ্ডিতে ক্লুনির মঠ স্থাপিত হয়।

(ঙ) ধর্ম সম্পর্কে আইনের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন —।

১৮। সঠিক উত্তরের পাশে এই চিহ্ন — দাও :—

(ক) চার্লস ৭৬৮/৭৬৯/৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

(খ) ৮০০/৮০১/৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হন শার্লামেন।

(গ) রেমণ্ড / লুলি। প্যারিস/রোম/বোলগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

(ঘ) 'ঈশ্বর কেন মানুষ হলেন' গ্রন্থের রচয়িতা চার্লস/সেন্ট এন্সেলম/এগিনহার্ড।

(ঙ) রবার্ট দ্য সর্বো / সেন্ট লুই / মন্তে ক্যাসিনো / ক্লুনি মঠের যাজক ছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্ত প্রথা

প্রথম পাঠ

সামন্ত প্রথা

শার্লামনের মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পরে পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক অরাজকতা চলতে থাকে। রাজারা ছিল দুর্বল এবং রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে অক্ষম। রাজনৈতিক অরাজকতার যুগে সামন্ত প্রথার সৃষ্টি হয়। জমির স্বত্বের উপর নির্ভর করে সামন্ত প্রথা গড়ে ওঠে। সামন্ত প্রথানুসারে জমির স্বত্বই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলে। রাজা শক্তিশালী জমিদারদের কাছে জমি বিলি-ব্যবস্থা করতেন, জমিদাররা আবার সেই জমি তালুকদারদের কাছে এবং তালুকদাররা আবার সেই জমি আরও ছোট ছোট মালিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করত। সাধারণতঃ প্রয়োজনের সময় সামরিক শক্তির বিনিময়ে এইভাবে জমি বিলি-ব্যবস্থা করা হত। যুদ্ধের সময় বড় বড় জমিদারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সৈন্য নিয়ে রাজাকে সাহায্য করতে হত। জমিদারদের অধীন তালুকদার বা ছোট ছোট জমিদাররা আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ সৈন্য নিয়ে তাদের উপরিওয়ালা জমিদারকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকত। তবে সাধারণতঃ কোন সামন্তই নিজ ব্যয়ে বছরে চল্লিশ দিনের বেশি কাজ করতে বাধ্য ছিল না। তবে সামরিক সাহায্য ছাড়াও সামন্ত-দের আরও কয়েকটি কর্তব্য পালন করতে হত। কোন সামন্তের মৃত্যু হলে তার পুত্র যখন সামন্তের পদ লাভ করত, তখন তাকে উপরি-ওয়ালাকে কিছু নজরানা দিতে হত। তাছাড়া রাজা বা জমিদার যুদ্ধে বন্দী হলে তার মুক্তিপণ, উপরিওয়ালার বড় মেয়ের বিয়ের সময় যৌতুক ও ছেলের অভিষেকের সময় অর্থ সাহায্য করতে হত। জমির স্বত্ব ভোগ করার জন্য প্রত্যেক সামন্তকেই তার উপরিওয়ালার কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে হত। রাজ্যের প্রধান

প্রধান সামন্তগণ রাজার কাছে এবং অন্যান্য সামন্তগণ তাদের উপরি-ওয়ালা সামন্তের কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে হত। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষা করাই ছিল সামন্তদের প্রধান কর্তব্য। তবে সামন্ত প্রথা এবং সামন্ত প্রথার সমস্ত আইন একদিনে অথবা কোন রাজার নির্দেশ গড়ে ওঠে নি। ধীরে ধীরে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামন্ত প্রথা গড়ে ওঠে এবং মধ্যযুগের অন্যতম শক্তিশালী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। সামন্ত প্রথা অনুযায়ী ইউরোপের সমাজ রাজা, ডিউক, ব্যারণ, নাইট ও ভূমিদাসে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় পাঠ

সামন্ত ঃ যাজক তন্ত্র

চার্চের প্রভাব ও নানারকম ধর্মীয় আইনের ফলে সামন্ত প্রতা আরও জটিল হয়ে পড়ে। চার্চই দেশের অধিকাংশ জমির মালিক। সুতরাং সামন্তদের মত চার্চও অন্যান্য জমিদারদের সঙ্গে চার্চের জমির বন্দোবস্ত করতে শুরু করে। ঐ সমস্ত জমি বণ্টন, আয়-ব্যায়ের হিসাব ভাল করে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সামন্তদের মত একটা শাসনতান্ত্রিক কাঠামোও চার্চে গড়ে ওঠে। বিশপ ও অন্যান্য যাজকরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সামন্তদের কাজ করতেন। ফলে ধর্মীয় কাজে যাজকদের প্রায়ই অবহেলা দেখা দিত। জমির মালিক হওয়ার জন্য যাজকদের সঙ্গে দেশের রাজা ও বড় বড় জমিদারদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকত। এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুযোগ দিয়ে শাসনতন্ত্রের উপর তাঁরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতেন।

সামন্ত প্রথার নিয়মানুযায়ী চার্চও কয়েকটি বিশেষ সুযোগ ভোগ করত। চার্চ একটি স্থায়ী সংগঠন। সুতরাং সামন্তদের মৃত্যুর পর তাদের উত্তরাধিকারীদের যে নজরানা দিতে হত, চার্চের তা কোনদিনই

দিতে হত না। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার দায়-দায়িত্ব তাদের ছিল না। তবে চার্চের সামন্তদের সৈন্য দিয়ে রাজাদের সাহায্য করতে হত।

ইউরোপের সামন্তর্দের যুগ ছিল যুদ্ধের যুগ। রাজা ও সামন্তদের অথবা সামন্তদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। তবে এই যুগে যাজকরাই যুদ্ধ বন্ধ করা এবং শান্তি স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করেন। প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের পর থেকে সোমবার সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য যাজকরা সবাইকে নির্দেশ দেন। তাঁদের এই নির্দেশের ফলে ইউরোপের যুদ্ধ কিছু পরিমাণে বন্ধ হয়।

সামন্ত প্রথা ছিল প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত শাসনের যুগ। সামন্ত প্রথার আইন অনুযায়ী রাজাই ছিলেন দেশের শাসক। অন্য সব সামন্তরা তাঁর প্রজা মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজার সমস্ত ক্ষমতাই সামন্তরা ভোগ করত। এমনকি সামরিক শক্তির জন্যও রাজাকে সামন্তদের উপর নির্ভর করতে হত। ফলে রাজা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েন। প্রত্যেক সামন্তই তাঁর জমিদারী স্বাধীনভাবে শাসন করত। প্রজারাও তাঁর প্রতি অনুগত থাকত। সামন্তদের অনেকেই পূর্বে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। শাসনকার্যে তাঁরা ছিলেন দক্ষ ও অভিজ্ঞ। নিজেদের জমিদারীর কাজেও তাঁরা সেই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাত। স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই জমিদাররা নিজেদের পছন্দমত লোককে সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত করত। চার্চের প্রধান প্রধান যাজক পদও স্থানীয় অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিরা অধিকার করত। এইভাবে রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি জমি-দারদের ব্যক্তিগত শাসনে পরিণত হয়। বিশেষতঃ দুর্বল রাজাদের আমলে জমিদাররা শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা আরও বেশি বাড়িয়ে তোলার সুযোগ পায়। বিচার বিভাগের অনেক ক্ষমতাই জমি-দাররা ভোগ করত। প্রত্যেক জমিদারের অধীনে বিচার সভা থাকত। স্থানীয় মামলা-মোকদ্দমা সেখানেই মীমাংসা হত। এই সব বিচার-

সভায় স্থানীয় সামন্তরা অনেক সুযোগ পেত। জমিদারদের অধীনে বিচারসভা গড়ে ওঠার ফলে রাজার ক্ষমতা আরও কমে যায় এবং জমিদারদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়।

তৃতীয় পাঠ

ইউরোপের শান্তি রক্ষায় জমিদারদের দুর্গ ও সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য

সামন্তদের সমাজ প্রকৃতপক্ষে যোদ্ধার সমাজ। শত্রুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বড় বড় সামন্তরা দুর্গ নির্মাণ করত। সামন্তদের প্রথমযুগে দুর্গগুলো খুব সাধারণ ভাবে তৈরি হত। দুর্গের চারদিক ঘিরে থাকত কাঠের প্রাচীর ও পরিখা। দুর্গ এবং দুর্গের বুরুজ কাঠ দিয়েই তৈরি হত। পরবর্তীকালে দুর্গ এবং দুর্গের প্রাচীর কাঠের পরিবর্তে পাথর দিয়ে তৈরি হতে থাকে। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীতে
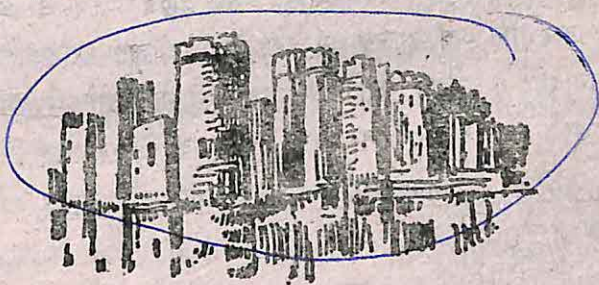
মধ্যযুগের দুর্গ

পাথরের দুর্গ প্রাচীরের বুরুজ তৈরী হয়। প্রত্যেক দুর্গেই খুব উঁচুতে একটা পাথরের তৈরি বুরুজ থাকত। সেখানে তৈরী হত দুর্গের কারাগার। কারাগারের উপর থাকত একটা প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম। প্রহরীরা সেখান থেকে দুর্গ পাহারা দিত। শত্রু কখনও যদি পরিখা পেরিয়ে দুর্গের প্রাচীর অধিকার করতে আসত, তাহলে দুর্গের সৈন্যরা কারা-গারের প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। শত্রুদের পক্ষে দুর্গের ঐ অংশ অধিকার করা খুবই কঠিন ছিল।

সাধারণ লোকের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্যই মধ্যযুগে

সামন্ত প্রথার উদ্ভব। সাধারণ লোকের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যেই ঐযুগে সামন্তরা তাদের দুর্গগুলো নির্মাণ করত। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে কাছাকাছি অঞ্চলের লোকেরা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করত। দীর্ঘকাল পর্যন্ত শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-সামগ্রী, অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম দুর্গে মজুত রাখা হত। কামান আবিস্কৃত হওয়ার পূর্বে এইসব দুর্গ অধিকার করা ছিল খুবই কঠিন। ফলে মধ্যযুগে এইসব দুর্গ স্থানীয় লোকের স্বাধীনতা, জীবন ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিত।

মধ্যযুগে সাধারণ লোকের জীবন ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষার জন্য সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যরাও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করত। সাধারণ লোকের পক্ষে ঘোড়া, যুদ্ধের পোশাক ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় করা ছিল খুবই কঠিন। এইসব সংগ্রহ করার জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। দ্রুতগামী অশ্ব, দুর্ভেদ্য বর্ম এবং তীক্ষ্ণ অস্ত্রের অধিকারী সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হত না। এইসব সৈন্যদের সাহায্যেই ইউরোপের লোকেরা মধ্যযুগে বাইরের আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করত।

চতুর্থ পাঠ

মধ্যযুগে ইউরোপের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামন্ত প্রথার সম্পর্ক

সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের সামন্ত প্রথার গুরুত্ব যথেষ্ট। অহেতুক যুদ্ধ এবং বিনা কারণে রক্তপাতই সামন্তপ্রথার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। রাজ্যের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূর করার উদ্দেশ্যেই সামন্তপ্রথার সৃষ্টি। অল্পদিনের মধ্যেই সামন্ত প্রথা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সমর্থ হয়। যতদিন পর্যন্ত ইউরোপের রাজারা আবার শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পারেন নি, ততদিন

পর্যন্ত সামন্তরা সাময়িক ভাবে কাজ পরিচালনা করার মত শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক রাষ্ট্রগুলো সমাজের জন্য যে সব কাজ করে, সামন্ততন্ত্র সে যুগে তাই করত। সামন্তদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক অরাজকতা দূর হয় ও ধীরে ধীরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পূর্বে দৈহিক শক্তির প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিত। কিন্তু এই যুগেই বিচারবিভাগ গড়ে উঠতে শুরু করে। আচার ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে আইন-কানুনের সৃষ্টি ও প্রভুভক্তি থেকেই দেশ-প্রেমের সূত্রপাত। সামন্তরাই মধ্যযুগের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখা ও উন্নত করার জন্য চেষ্টা করে। সামন্তদের চেষ্টাতেই সর্বপ্রথম ইউরোপে গণতান্ত্রিক প্রথার সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতাও এই যুগেই প্রথম দেখা দেয়। মধ্যযুগের লোকেরা সামন্তদের দেশশাসন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সামন্তদের এই কৃতিত্বকে খুব প্রশংসা করে। দীর্ঘদিন অশান্তি ও অরাজকতার পর এই নতুন ধরনের শাসনতন্ত্র সাধারণ লোকের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা এনে দেয়। সামন্তদের রাজনৈতিক সংস্থাকে তারা আদর্শ বলে মনে করে।

শুধু রাষ্ট্রশাসন ও রাজনীতিতে নয়, অর্থনৈতিক জীবনেও সামন্তপ্রথা অনেক পরিবর্তন এনে দেয়। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য আবার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নতুন নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। মধ্যযুগেই ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে অনেক নতুন শহরের পত্তন হয়। শহরগুলো সাধারণতঃ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। নিরাপদে এইসব শহরে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ পেত। অনেক সময় শহরগুলো নদীর তীরে গড়ে উঠত। ফলে ব্যবসায়ীরা নৌ-পথেও বাণিজ্য করার সুযোগ পেত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি মধ্যযুগের মানুষের সামাজিক জীবনেও অনেক পরিবর্তন এনে দেয়। যদিও এই যুগে সাধারণ লোকের জীবন খুব সুখের ছিল না, তথাপি নতুন নতুন কাজের সম্ভাবনা তাদের জীবনে সুখের সন্ধান এনে দেয়। সমাজে এই যুগে পরিষ্কারভাবে তিনটি শ্রেণীর

সৃষ্টি হয় – অভিজাত, যাজক ও সাধারণ লোক। তাদের জীবনযাত্রার মধ্যেও প্রচণ্ড পার্থক্যের সৃষ্টি হতে শুরু করে। তবে মধ্যযুগের মানুষ তখনও এর কারণ খুঁজতে আরম্ভ করে নি। তারা এই শ্রেণীবিভাগকে স্বাভাবিক বলেই মনে করত। সামন্ত প্রথার কুফলগুলো তখনও তারা বুঝতে পারে নি। যে সামন্ত প্রথা সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে ইউরোপে গড়ে উঠেছিল, তা যে ধীরে ধীরে ইউরোপের রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে সে-কথা তারা তখনও উপলব্ধি করতে পারে নি।

পঞ্চম পাঠ

শিভ্যালরি

মধ্যযুগের নাইট বা বীরদের বীরধর্ম ও রীতি-নীতিকে শিভ্যালরি বলে। প্রত্যেক সমাজেই সম্ভ্রান্ত লোকের কোন-না-কোন আদর্শ থাকে। সামন্ত যুগেও তার কোন ব্যতিক্রম ছিল না। মধ্যযুগে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত লোকই ছিলেন বীর যোদ্ধা এবং জীবনে তারা কতকগুলো নীতি মেনে চলত। সামন্ত যুগের প্রথম দিকে সব সময়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। সে সময় অসম সাহসী বীর যোদ্ধাই ছিলেন সকলের আদর্শ। মরতে যারা ভয় পায় না, কথা যারা খেলাপ করে না, প্রভুর প্রতি যারা একান্তভাবে ভক্ত, এবং নিজের প্রাণের বিনিময়ে যারা সামন্তদের প্রাণ রক্ষা করতে প্রস্তুত, তাকেই আদর্শ বীর বলে মনে করা হত। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলার জন্য এইসব বীরদের কঠোর সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। এইসব

মধ্যযুগের নাইট (বীর)

সৈন্যদের প্রথম জীবনে কোন সম্ভ্রান্ত জমিদারের বাড়ীতে বালকভৃত্য-রূপে কাজ করতে হত। তারপর সে জমিদারের পার্শ্বচর হিসাবে কাজ করত। তখন তাকে স্কোয়ার বলা হত। যৌবনে সে 'নাইট' বা যোদ্ধার পদ লাভ করত নাইট উপাধি লাভ করার জন্য তাকে অস্ত্র চালনায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের পরিচয় দিতে হত। যুদ্ধের প্রতিটি পরীক্ষায় ঠিকমত উত্তীর্ণ হয়ে সে নাইট উপাধি পেত। দুর্বলকে রক্ষা করা ও নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই ছিল নাইটদের আদর্শ। প্রথম দিকে নাইট উপাধি পাওয়ার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে নাইট উপাধিতে ভূষিত হওয়ার আগে প্রত্যেক যোদ্ধাকেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার জন্যে চার্চে একরাত্রি বাস করা এবং পুরোহিতদের উপদেশ শুনতে হত। নাইট উপাধিতে ভূষিত হওয়ার জন্য যোদ্ধাদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হত। তাদের নিজেদের অর্থেই অস্ত্র-শস্ত্র, বর্ম, ঘোড়া, একজন স্কোয়ার এবং কয়েকজন চাকর সংগ্রহ করতে হত। এজন্য অনেক যোদ্ধাই নাইট হওয়ার সুযোগ পেত না। তারা সারাজীবন স্কোয়ার হিসাবে কাটিয়ে দিতে বাধ্য হত।

ট্রুব্যাডুর ঃ একাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে গীতিকাব্য রচয়িতা কবিগণ ট্রুব্যাডুর নামে পরিচিত। মধ্যযুগে সমস্ত পশ্চিম ইউরোপে সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল ফরাসী দেশ। এই যুগে উত্তর ফ্রান্সের কবিরা মহাকাব্য পছন্দ করতেন এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের কবিরা পছন্দ করতেন গীতিকাব্য। দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রোভেন্স অঞ্চল গতি-কাব্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রায় পাঁচশজন কবির নাম জানার পর তারা অসংখ্য গীতিকাব্য রচনা করেন। তাদের সব কবিতাই নাইটদের বীরত্ব ও আদর্শের গাথা। কবিরা সাধারণতঃ বড় বড় সামন্তের দরবারে এইসব কবিতা সুর দিয়ে গেয়ে শোনাতেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রায় সব সামন্তের দরবারেই তাদের খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের কবিদের মধ্যে আরণ্যোৎ ত্য ম্যারিফুল, বার্ণাদ্ ত্য ভেন্তান্দুর, পিয়ের কার্ডিন্যাল, বার্ণাদ্ ত্য ভ্যাকুইয়ারস্ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

ষষ্ঠ পাঠ

জমিদারদের খাস জমি ও খামার ব্যবস্থা : খামার বাড়ী

সামন্ত প্রথার রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রধান কেন্দ্র ছিল জমিদারদের খাস জমি ও খামার বাড়ী। গ্রামের সমস্ত চাষীরা জমিদারদের জমিতে চাষবাস করত। খামার বাড়ীগুলো সাধারণতঃ একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত। তবে কখনও কখনও একটি খামার বাড়ীর অধীনে কয়েকটি গ্রামও থাকত। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সব কিছুই খামার বাড়ীতে উৎপন্ন হত। এমন কি চাকাওয়ালা গাড়ী, একজন কাঠের মিস্ত্রি এবং একজন লোহার কর্মকারও খামার বাড়ীতে থাকত। খামার বাড়ীর সঙ্গে যুক্ত
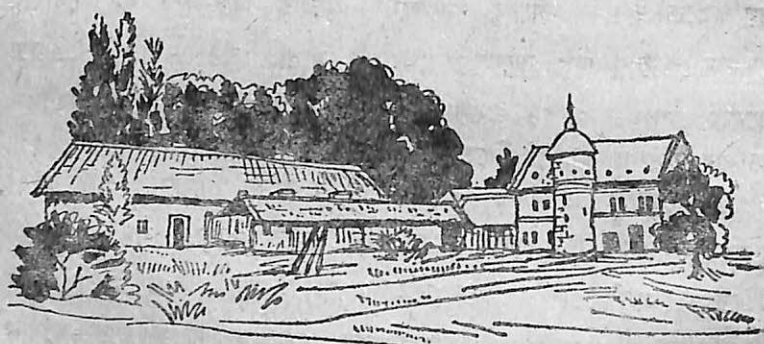
খামার বাড়ী

বিচার সভার সাহায্যেই জমিদাররা কৃষকদের উপর অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার কার্যকরী করার সুযোগ পেত। কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম ও খাজনার উপর নির্ভর করে অভিজাতদের সামন্তপ্রথা গড়ে ওঠে। কৃষিই ছিল মধ্যযুগের অর্থনীতির প্রধান বুনিয়াদ। কৃষকরা জমি চাষ করে প্রচুর ফসল ফলাত বলেই জমির মালিক সামন্তরা শিকার করে, যুদ্ধ করে, দুর্গ ও গীর্জা তৈরি করে মনের আনন্দে জীবন কাটিয়ে দিত।

মধ্যযুগের ইউরোপের প্রায় শতকরা নব্বইজন লোক কৃষকের কাজ করত। আর বাকি দশ শতাংশ ছিল জমিদার ও যাজক। তারা জীবিকা অর্জনের জন্য প্রকৃতপক্ষে কৃষকের উপর নির্ভর করত। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের অর্থনীতি পুরোপুরি নির্ভর করত কৃষির উপর। মধ্যযুগে ইতিহাস ও সভ্যতা গড়ে তোলার ব্যাপারেও কৃষক এবং কৃষির দান সবচেয়ে বেশি।

খামারের শাসন-ব্যবস্থা ঃ প্রত্যেক খামারেই সুষ্ঠুভাবে স্থানীয় শসন পরিচালনা ও কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য কয়েকজন কর্মচারী নিযুক্ত হত। খামারের গোমস্তা এবং পেয়াদারা ছিল জমিদারের

মধ্যযুগের 'ম্যানর' পরিকল্পনা

খামার বাড়ীর নক্সা

নিজস্ব কর্মচারী। তাছাড়া খামারের কৃষকদের দ্বারা মনোনীত আরও কয়েকজন কর্মচারী সেখানে থাকত। প্রত্যেক খামারেই একজন করে সাধারণ পরিদর্শক থাকত। একজন স্বাস্থ্যবান ও নিষ্ঠুর

প্রকৃতির লোককে খামারের পাহারাদার নিযুক্ত করা হত। বন্য পশুরা যাতে খামারে ঢুকে কৃষিকার্য নষ্ট করতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাই ছিল তার প্রধান কর্তব্য। চাষীরা যাতে আনন্দে, স্ফূর্তিতে দিন কাটায় ও নিয়মিত গরু ও মহিষের চর্চা করে, সেদিকেও তাদের কঠোর দৃষ্টি থাকত। ভালভাবে গোশালা দেখাশুনার জন্য একজন গোশালা কর্ত্রী নিযুক্ত হত। গরু, ভেড়া, শূকর চরাবার জন্য একজন লোক থাকত। জমিদারের খাস জমি চাষ করতে গিয়ে যদি কোন কৃষক কাজে ফাঁকি দিত, তাহলে তাকে খুব প্রহার করা হত।

সাধারণতঃ প্রত্যেক খামারেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র উৎপন্ন হত। উদ্বৃত্ত এইসব জিনিসপত্র বিক্রি করার জন্য আলাদা লোক থাকত।

খামারের বিচারালয়; প্রত্যেক খামারেই বিচারের জন্য আলাদা লোক নিযুক্ত থাকত। খামারের প্রত্যেক অধিবাসী বিচারালয়ে উপস্থিত থাকতে বাধ্য থাকত। বিচারালয় সাধারণতঃ খামারের চার্চে, খামার বাড়ীর হলঘরে অথবা বাইরের কোন গাছের ছায়ায় বসত। এই বিচারালয়ের মাধ্যমেই সম্পত্তির উপর জমিদারের অধিকার এবং গ্রামবাসীদের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী অধিকার কার্যকরী করা হত। বিচারালয়ে কৃষকদের ডাকা হত এবং চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বিচার করা হত। কৃষকদের কোন চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘনের জন্য তার ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কৃষকরাই ঠিক করত। বিবাদ নিষ্পত্তির পর জমিদার অথবা কৃষকদের নামে বিচারের রায় দেওয়া হত। পরবর্তীকালে খামারের আইন-কানুন ও বিচারের রীতি-নীতি লিখিতভাবে তৈরি করা হত। খুব স্বাভাবিকভাবেই জমিদারের স্বার্থরক্ষার জন্য এই আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা ছিল। তখন থেকেই বিচারালয়ের পক্ষে কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠত। বিচারালয়ে যে সমস্ত জরিমানা আদায় হত, তার সব কিছুই ছিল জমিদারের প্রাপ্য। জরিমানা থেকেও জমিদারের কিছু আয়

সপ্তম পাঠ

খামারের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ গ্রামবাসীদের যৌথ চাষ-প্রথা

ছোট জমিদারদের একটিই খামার থাকত। বড় জমিদাররা ছিল অনেক খামারের মালিক। সাধারণতঃ ন'শ থেকে দু'হাজার একর জমি নিয়ে একটি খামার বাড়ী গড়ে ওঠত। তার সঙ্গে থাকত ঘাসে ঢাকা জমি, পশুচারণের জমি, বনজঙ্গলে ঢাকা জমি, পতিত জমি। জমিদারের নিজস্ব জমি থাকত এইসব জমি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এইসব জমি একসঙ্গে মিলেই গড়ে ওঠত জমিদারের জমিদারী।

চাষের জমিগুলোর চারদিকে সাধারণতঃ কোন বেড়া থাকত না। গ্রামের সমস্ত কৃষকদের সাহায্যে জমি চাষ, বীজবোনা ও ফসল কাটার কাজ করা হত। অপরের সাহায্য ব্যতীত কোন কৃষকের পক্ষেই এইসব কাজ করা সম্ভব হত না। হয়তো কোন কৃষকের লাঙল থাকত, কিন্তু লাঙল টানার জন্য প্রয়োজনীয় বলদ থাকত না। পাথর ও কাঁকরে ভরা জমি পরিষ্কার করে চাষের উপযোগী করে তোলা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। বনজঙ্গলে ভরা জমি পরিষ্কার করা একজন কৃষকের পক্ষে সম্ভব অর্থও না। চাষবাষের যন্ত্রপাতিও ছিল অত্যন্ত সেকেলে ধরনের। তাছাড়া তখনকার বলদগুলো ছিল বর্তমান যুগের বলদের চেয়ে আকৃতিতে ছোট ও শারীরিক শক্তিতে দুর্বল। মোটামুটি সেগুলো দেখতে ছিল বর্তমান যুগের বকনা বাছুরের মত। চাষের সময় গ্রামে যে দশ বারো জোড়া বলদ পাওয়া যেত, সবগুলোই একত্রে লাঙলের জোয়ালের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। জমির ফসল ঘরে তোলার সময়ও সব চাষীদের একসঙ্গে কাজ করতে হত। না হলে পাকা শস্যের অনেকগুলো শস্য মাঠে নষ্ট হয়ে যেত। সুতরাং তাড়াতাড়ি ফসল তোলার জন্য গ্রামের সব স্ত্রী-পুরুষ-শিশু সবাই একসঙ্গে মিলে ফসল কাটতে শুরু করত। ফসল কাটা শেষ হয়ে গেলে সমস্ত শস্যক্ষেত্র গ্রামবাসীদের পশুচারণের ক্ষেত্রে পরিণত হত।

ভূমিদাসদের পরিশ্রম ও খাজনা : মধ্যযুগে ইউরোপের কৃষক বা ভূমিদাসদের সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হত। প্রত্যেক চাষীরই নিজের অধীনে জমি থাকত বিশ থেকে ত্রিশ একর। সেসব জমি চাষ করার পর তাদেরকে আবার জমিদারের খাসজমি চাষ করতে হত। কৃষকদের পক্ষে জমিদারের জমিতে ভূমিদাসের মত কাজ করাই ছিল খামার প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামন্তপ্রথার নিয়মানুযায়ী ভূমিদাসরা জমিদারের সব রকম কাজ করতে বাধ্য ছিল। এমন কি, কখন তাদের কোন্ কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। যদিও পরবর্তীকালে ভূমিদাসদের সপ্তাহে তিনদিন করে দু'টো বলদ নিয়ে জমিদারের জমিতে কাজ করতে হত। এই তিন দিনেই চাষ, বীজবোনা, জমি পরিষ্কার করা ও ফসল কাটার কাজ শেষ হত। ফসল কাটা বা অন্য কোন সময় বেশী কাজের প্রয়োজন দেখা দিলে কৃষকরা জমিদারের নির্দেশে আরও বেশী কাজ করতে বাধ্য হত। জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা, গোলা-বাড়ীতে শুকনো খড় রেখে দেওয়া এবং শস্য ভাণ্ডারে ফসল তোলার কাজও তাদের করতে হত। তাছাড়া রাস্তা তৈরি, পুল মেরামত, কুঁয়া কাটা, নর্দমা খোঁড়া ও দুর্গ পরিখা পরিষ্কার করার জন্য তাদের বেগার খাটার নিয়ম ছিল। ভূমিদাসের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরও খামার বাড়ীর অনেক কাজে লাগান হত। সবসময়ই জমিদারের জমি ও তার কাজই বেশি গুরুত্ব পেত। জমিদারের ও খামারের কাজ করে বাকি যে সময়টুকু থাকত, সেই সময়ের মধ্যেই তাদের নিজেদের কাজ শেষ করতে হত। তবে শুধু দৈহিক পরিশ্রম করেই ভূমিদাসরা রেহাই পেত না, তাদের আয়ের একটা বিরাট অংশই জমিদাররা খাজনা হিসাবে আদায় করে নিত।

অষ্টম পাঠ

ভূমিদাসদের জীবনযাত্রা

খামারের গ্রামে সাধারণতঃ বারো থেকে পনরোটি পরিবার বাস করত। বড় গ্রামে পঞ্চাশ থেকে ষাটটি পরিবারও বাস করত। এই

সব গ্রামে ভূমিদাসদের একঘেয়ে জীবন কাটাতে হত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জানালাবিহীন ঘরে তারা বাস করত। বিড়াল, কুকুর, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি সব কিছু একইঘরে বাস করত। রাত্রে ঘরে কোন প্রকার আলোর ব্যবস্থা ছিল না।

কৃষকদের ঘরের সঙ্গেই একফালি জমি থাকত। সেখানে তারা শাক-সব্‌জি লাগাত। টাটকা মাছ মাংস পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। মোটা রুটি, শাক-সব্‌জি, দুধ ও মাখনই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। ভাল এবং সুস্বাদু খাদ্য ও গরম জামাকাপড় সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। অনেকে দু'বেলা পেট পুরে খেতেও পারত না। দুর্ভিক্ষের সময় কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ত।

কৃষকদের এই শোচনীয় জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলত অমানুষিক পরিশ্রম, বাধ্যতামূলক কাজ এবং নানারকম খাজনা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের নানারকম কঠোর পরিশ্রম করতে হত। জমিদারের ভয়ে বাড়ীতে বসে বিশ্রাম করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। বৃষ্টি, ঝড়, তুষারপাত প্রভৃতি সবকিছু উপেক্ষা করেও তাদের কাজ করতে হত। এত পরিশ্রম করে সারাবছর ধরে কৃষকরা যে সামান্য অর্থ ব্যয় করত, সুযোগ পেলেই জমিদাররা সেটুকুও কেড়ে নিত। যোদ্ধারা তাদের মাইনে পেয়েই সন্তুষ্ট হত না। খাজনা এবং কর আদায় করে জমিদাররা সন্তুষ্ট হত না, প্রয়োজন হলে কৃষকদের কাছ থেকে তারা বে-আইনি ভাবে অর্থও আদায় করত।

জমিদার ও চার্চের কর : সামন্তপ্রথার নিয়মানুযায়ী কৃষকদের কাছ থেকে জমিদার যত খুশি কর আদায় করতে পারত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় রীতি-নীতি মেনেই জমিদাররা ভূমিদাসদের উপর কর বসাতেন। ভূমিদাসরা এই কর নগদ অর্থে বা যে-কোন ভাবে শোধ করতে পারত। তবে অনেক জমিদার ভূমিদাসদের কাছ থেকে ভাল কাজ পাওয়ার জন্য বেশি কর আদায় করত। চার্চও বেশি কর আদায় না-করার জন্য জমিদারদের সর্তক করে দিত। সব ভূমিদাসকেই জমিদারকে বার্ষিক খাজনা দিতে হত। তবে এই খাজনার

পরিমাণ বেশি ছিল না। সাধারণতঃ ভূমিদাসদের কয়েক পেনী ও কয়েক পাউণ্ড মাখন বা মোম ঐ খাজনা বাবদ জমিদারকে দিতে হত। তবে এই কর দাসত্বের চিহ্ন বলে মনে করা হত বলে অনেকেই একে অপছন্দ করত। প্রত্যেক ভূমিদাসের মাথাপিছু প্রতি বছর 'ট্যালেজ' নামে আর এক প্রকার কর দিতে হত। তবে সম্পত্তির পরিমাণ অনুযায়ীই প্রত্যেককে এই কর দিতে হত। পুল, রাস্তা প্রভৃতির জন্যও জমিদার কর পেত। তাছাড়া সামন্ত প্রথার নিয়মানুযায়ী, জমিদার জিনিসপত্রের মাধ্যমে অনেক কর আদায় করত। বড়দিন ও ইস্টার উৎসবের সময় ভূমিদাসরা জমিদারকে প্রচুর কর দিতে বাধ্য থাকত। তাছাড়া কোন ভূমিদাসের মৃত্যুর পর তার ছেলে যখন সম্পত্তির মালিক হত, তখন তাকেও কর দিতে হত। তবে সাধারণ কোন আসবাবপত্র বা গৃহপালিত পশু দিয়েই এই কর শোধ করা হত। পশুচারণের ক্ষেত্র, বন ও পতিত জমি ব্যবহারের জন্যও ভূমিদাসকে কর দিতে হত।

জমিদারদের কর ছাড়াও ভূমিদাসদের চার্চে ধর্মকর জমা দিতে হত। তবে পুরোপুরি ধর্মকর দেওয়া হয় নি, এই অজুহাতে চার্চের লোকেরা ভূমিদাসদের কাছ থেকে বেছে বেছে ভাল ভাল গৃহপালিত পশু ইত্যাদি আদায় করে নিত।

নবম পাঠ

দুর্গের জীবনযাত্রা

দুর্গই ছিল সামন্তদের বাসস্থান, জমিদারী শাসনকার্যের প্রধান কেন্দ্র, বিচার সভা, খাজাঞ্চিখানা এবং অতিথিদের সঙ্গে দেখা করার স্থান। সাধারণতঃ দুর্গের একদিকে সামন্তরা সপরিবারে বাস করত। সামন্তদের পরামর্শদাতা, দেহরক্ষী, উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ, খানসামা প্রভৃতি দুর্গেই বাস করত। সামন্তের স্ত্রীও শাসনকার্যে দক্ষতা অর্জন করে সামন্তকে নানাভাবে সাহায্য করত। প্রয়োজন দেখা দিলে সামন্তের স্ত্রী দুর্গরক্ষার জন্য যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করতেন। তবে দুর্গের পারিবারিক দিকে লক্ষ্য রাখাই ছিল তার প্রধান কর্তব্য।

দুর্গে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চিত করা হত। দুর্গে বাঁধাকপি, শালগম, গাজর, পেঁয়াজ, শিম, কড়াইশুটি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে মজুত করা হত। ফলের মধ্যে আপেল ও ন্যাসপাতি ছিল প্রধান। মাছ, মাংস ও দুধ প্রচুর পরিমাণে থাকত। তবে পনীর তৈরির জন্যই বেশী দুধের ব্যবহার হত। চা ও কফির কোন ব্যবহার না থাকলেও পানীয় হিসাবে মদ জনপ্রিয় ছিল। ইউরোপের লোকেরা তখনও চিনির ব্যবহার জানত না। চিনির পরিবর্তে ফলের রস ও মধুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

দুর্গের লোকেরা সাধারণতঃ বিশ্রাম করার কোন সুযোগ পেতো না। বিশেষতঃ মেয়েদের কাজের কোন শেষ ছিল না। সারাবছরই নানাধরণের অতিথি দুর্গে এসে উপস্থিত হত। অনেক সময় গভীর রাত্রি পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া চলত। খাওয়া-দাওয়ার দিকেও তাদের খুব ঝোঁক ছিল। আলোর জন্য সাধারণতঃ মোমবাতি ব্যবহার করা হত। জমিদারশ্রেণীর লোকের মধ্যে পাশাখেলা ও পশুশিকার খুব জনপ্রিয় ছিল। তবে সব জমিদারই খাওয়া-দাওয়া ও পশুশিকার নিয়ে মেতে থাকত না, অনেকেই সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতিতে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন।

সমাজের তিনটি শ্রেণী : মধ্যযুগের সমাজে তিনটি পৃথক পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণী তাদের নির্দিষ্ট কাজ করতে বাধ্য ছিল। যাজকদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল সমাজের প্রথম শ্রেণী। ধর্মীয় অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই ছিল তাদের কাজ। সামন্ত বা অভিজাতদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণী। দেশশাসন ছিল তাদের প্রধান কাজ। যাজক ও অভিজাত শ্রেণী ব্যতীত বাকি সবাই তৃতীয় শ্রেণীর লোক। অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদায় সামন্তরা ছিল এক প্রান্তে, আর সাধারণ লোকেরা ছিল আর এক প্রান্তে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যাতে সুষ্ঠুভাবে

কাজ করতে পারে, সেজন্য কঠোর পরিশ্রম করাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র কর্তব্য। যাজকদের অনেকেই জমিদার ছিল। সুতরাং সামন্ত প্রথার নিয়মানুযায়ী তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠত। মধ্যযুগে দেশের শাসন, ধর্ম, অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা সবাই সামন্ত প্রথার উপর নির্ভর করত। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অভাবের জন্য স্বেচ্ছাচারী জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করা অনেক সময় সম্ভব হত না। তথাপি সাধারণভাবে বলতে গেলে সামন্তপ্রথা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইউরোপে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং প্রয়োজন অনুসারে দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়।

দশম পাঠ

ভূমিদাস : জমিদারের অস্থাবর সম্পত্তি

সামন্ত প্রথার আইন অনুযায়ী ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। আইন অনুসারে ভূমিদাস ছিল জমিদারের অস্থাবর সম্পত্তি। ভূমিদাসরা কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। বাজারে তাদের বেচাকেনা করাও চলত। মোটামুটিভাবে একটি ভাল ঘোড়া ও একটি ভূমিদাসের দাম প্রায় একই ছিল। তবে প্রয়োজন হলে একজন ভূমিদাস অপর ভূমিদাসের বিরুদ্ধে বিচারসভায় মামলা করতে পারত। কিন্তু সে কখনও একজন স্বাধীন মানুষ বা জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারত না। স্বাধীনভাবে কিছু করার ক্ষমতাও তার ছিল না। এক খামার ছেড়ে অন্য খামারে বা শহরে পালিয়ে যেতে পারত না। পালিয়ে যাওয়া ভূমিদাসকে ধরে আনার ক্ষমতা জমিদাররা ভোগ করত। যে জমি সে চাষ করত, তার সঙ্গে ভূমিদাসের জীবন চিরকালের জন্য জড়িয়ে পড়ত। খামার বা জমি বিক্রি হয়ে গেলে, তার সঙ্গে ভূমিদাসও বিক্রি হয়ে যেত। বিয়ে করার ব্যাপারেও তাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। জমিদারের অনুমতি পেলে তারা বিয়ে করতে পারত। বিয়ে করার জন্য আবার তাকে জমিদারকে কর

দিতে হত। ভূমিদাসের সন্তানদের আবার জমিদার অস্থাবর সম্পত্তি বলে মনে করত। জমিদারের অনুমতি না পেলে কোন ভূমিদাস তার ছেলেকে লেখাপড়া করার জন্য স্কুলে বা চার্চে পাঠাতে পারত না। আবার স্কুলে বা চার্চে পাঠাবার জন্যও জমিদার ভূমিদাসের কাছ থেকে কর আদায় করত।

জমিদারের জমিতে ও বাড়ীতে কাজ করা এবং গৃহপালিত পশুর দেখাশুনা করাই ছিল ভূমিদাসের দায়িত্ব। প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে তিনদিন করে ভূমিদাসকে জমিদারের বাড়ীতে কাজ করতে হত। ভূমিদাস কোন স্বাধীন মেয়েকে বিয়ে করলেও তাদের সন্তানরা ভূমিদাস হত। কোন কোন জায়গায় স্থানীয় রীতি অনুযায়ী স্বাধীন মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ফলে স্বামীর সামাজিক পদমর্যাদার পরিবর্তন হত এবং সে স্বাধীন সমাজে স্থান পেত।

দাসত্ব থেকে পরিত্রাণের পথ : কয়েকটি উপায়ে ভূমিদাসরা তাদের এই দাসত্বের যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তি পেত। জমিদারের অনুমতি নিয়ে যে-কোন দাস স্বাধীন সন্ন্যাসীরূপে চার্চে যোগ দিতে পারত। অনেক ভূমিদাসই দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য এই সহজ উপায় বেছে নিত। তবে প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে অন্য দু'ভাবেও অনেকে স্বাধীনতা জোর করে অর্জন করত। প্রথমতঃ, শহরে পালিয়ে গিয়ে তারা কোন কলকারখানা বা বাণিজ্য কেন্দ্রে চাকুরি যোগাড় করে নিত। শহরে একবার পৌছতে পারলে তারা নিরাপদে জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার সুযোগ পেত। দ্বিতীয়তঃ, ভূমিদাসরা জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারত বা বিদ্রোহ করার ভয় দেখাতে পারত। প্রথম প্রথম জমিদাররা অত্যন্ত কঠোরভাবে এই সব বিদ্রোহ দমন করত। কিন্তু তাতে কোন সুফল হল না। ভূমিদাসরা সবাই একসঙ্গে খামার ত্যাগ করতে শুরু করে। তখন জমিদাসরা বাধ্য হয়ে ভূমিদাসের দাবি মেনে নেয়। এইভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত ভূমিদাস স্বাধীনতা লাভ করে।

অনুশীলনী

১। সামন্ত প্রথার মূল কথা কি? সামন্ত প্রথার আইন-কানুন সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। সামন্ত যাজক তন্ত্র সম্বন্ধে কি জান?

৩। রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তিগত শাসন কিভাবে গড়ে ওঠে?

৪। ইউরোপের শান্তি রক্ষার ব্যাপারে সামন্তদের দুর্গের ও অশ্বারোহী সৈন্যদের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৫। মধ্যযুগের ইউরোপের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামন্ত প্রথার কিরূপ সম্পর্ক ছিল?

৬। শিভ্যালরি বলতে কি বুঝ? শিভ্যালরির নিয়মগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। ট্রুব্যাডুর কাদের বলে? ট্রুব্যাডুরদের সম্পর্কে কি জান?

৮। জমিদার, খাস জমি ও খামার বাড়ী সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৯। খামারগুলোর শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

১০। খামারের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে কি জান?

১১। খামারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হত?

১২। ভূমিদাসদের কি কি কাজ করতে হত?

১৩। ভূমিদাসদের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল?

১৪। ভূমিদাসদের কি কি কর দিতে হত? কিভাবে এই কর আদায় করা হত?

১৫। সামন্তদের দুর্গের জীবনযাত্রা কি রকম ছিল?

১৬। মধ্যযুগের ইউরোপের সমাজের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কি জান?

১৭। ভূমিদাসদের কেন জমিদারের অস্থাবর সম্পত্তি বলা হত?

১৮। ভূমিদাসরা কিভাবে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারত?

১৯। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) সামন্তদের দুর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্য কি ছিল?

(খ) সামন্ত প্রথা ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবনে কি পরিবর্তন সাধন করে?

(গ) মধ্যযুগের লোকেরা সামন্ত প্রথাকে কেন আদর্শ ব্যবস্থা বলে মনে করত?

(ঘ) খামারের জমি-চাষের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?

(ঙ) মধ্যযুগের সামন্ত প্রথার আইন-কানুন থেকে কিভাবে বিচার ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় ?

২০। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) ধীরে ধীরে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে — গড়ে ওঠে।

(খ) ইউরোপের — যুগ ছিল প্রকৃতপক্ষে — —।

(গ) সামন্তদের — প্রকৃত পক্ষে — —।

২১। সংক্ষেপে টীকা লিখ—(ক) ট্রুব্যাডুর ; (খ) শিভালরি ; (গ) খামার বাড়ী ; (ঘ) ধর্মকর ; (ঙ) ভূমিদাস ; (চ) ট্যালেজ।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

ধর্মযুদ্ধ

ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য : ইসলামধর্মের উত্থান ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধির পর থেকেই পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের নতুন সংকট দেখা দেয়। প্রথম দিকে তারা মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করে এবং মুসলমানদের হাত থেকে ইউরোপের জনসাধারণের স্বাধীনতা, ধর্ম ও সভ্যতা রক্ষা করে। কিন্তু ধীরে ধীরে পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের এই দুর্বলতার সুযোগে মুসলমানেরা বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্য অধিকার করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

বাগদাদের শাসনকর্তা সেলজুক বংশের তুর্কীরা ১০৭১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট রোমুলাসকে ম্যানজিকার্টের যুদ্ধে পরাজিত করে। ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের উপর তুর্কীদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টানদের পবিত্রস্থান জেরুজালেম মুসলমানদের অধিকারে চলে যায় এবং বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। রোমুলাসের পর কনস্ট্যান্টিনোপলের

সিংহাসনে বসেন প্রথম অ্যালেক্সিস। সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের খ্রীষ্টধর্ম রক্ষার জন্য তিনি রোমের পোপ দ্বিতীয় আরবানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। পোপ তখন জেরুজালেম রক্ষার জন্য পশ্চিম ইউরোপের অধিবাসীদের কাছে আবেদন জানান। পোপের আবেদনের ফলে সমস্ত শ্রেণীর খ্রীষ্টানদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ধর্মীয় উন্মাদনা দেখা দেয়। একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের বহু যোদ্ধা ও অন্যান্য লোক তুর্কীদের হাত থেকে জেরুজালেম রক্ষার জন্য চেষ্টা করে। ইতিহাসে এই ঘটনা ক্রুসেড ও ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। রাজা, রাজপুত্র, বিশপ, অভিজাত সম্প্রদায়, বীরযোদ্ধা, ধনী-নির্ধন, বৃদ্ধ, শিশু, বালক প্রভৃতি সকলেই এই ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কনস্ট্যান্টিনোপল অভিমুখে যাত্রা করে।

ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ ব্যক্তিই ধর্মরক্ষার উৎসাহে এই অভিযানে যোগ দেয়। তবে অনেক দুঃসাহসিক কর্মে অভিজ্ঞতা অর্জন ও লুঠপাটের আশায় এবং অনেকে শাস্তি ও দাসত্বের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। অনেকের আবার অন্য রকম উদ্দেশ্য ছিল। সিরিয়ার উর্বর জমির উপর জমিদারদের লোভ ছিল। বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেছিল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়ে দুর্বৃত্তরা বিচার ও শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেল। অভিযানে যোগ দিয়ে ঋণ পরিশোধ না করার সুযোগ পেল একদল লোক। তবে অনেক সাধারণ লোক ও দুঃসাহসিক ব্যক্তি নিছক শখ করেই ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতে এগিয়ে আসে।

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ : প্রথম ধর্মযুদ্ধের সৈন্যবাহিনী ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ থেকে যাত্রা করে এবং ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার করে। ধর্মযুদ্ধগুলোর মধ্যে প্রথম অভিযানই সাফল্য লাভ করে। জেরুজালেম অধিকার করার পর সেখানে তারা একটি নতুন রাজ্য স্থাপন করে। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই

রাজ্যের স্বাধীনতা অটুট থাকে। তাছাড়া অ্যান্টিয়োক, এডেসা ও ত্রিপোলি তাদের অধিকারে আসে।

১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান শাসনকর্তা সালাদিন খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে জেরুজালেম অধিকার করেন। ফলে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। যদিও জার্মানীর ফ্রেডারিক বারবারোসা, ইংল্যাণ্ডের সিংহহৃদয় রিচার্ড, এবং ফ্রান্সের ফিলিপ অগাস্টাস—ইউরোপের এই তিন শক্তিশালী রাজা এই যুদ্ধে যোগ দেন, তথাপি তাঁদের মধ্যে মিল না থাকার জন্যই এই অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়। এই অভিযানের কার্য-কলাপ লক্ষ্য করলে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, ধর্মযুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ভেনিসের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এই অভিযান পাঠান হয়। ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে তারা কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে সেন্ট সোফিয়ার পবিত্র বেদী তারা ধ্বংস করে এবং শহরে নৃশংসভাবে লুঠপাট চালায়।

দ্বিতীয় পাঠ

ইউরোপের সমাজ ও সভ্যতার উপর ধর্মযুদ্ধের প্রভাব

ধর্মযুদ্ধের ফলে পোপের সম্মান সামান্য বৃদ্ধি পেলেও ধর্মযুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হয়। তুর্কীদের হাত থেকে জেরু-জালেম উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। ইসলামধর্মের অগ্রগতিও রুদ্ধ করা যায় নি। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় ব্যাপারে ধর্মযুদ্ধের ফলাফল একেবারে গুরুত্বহীন। কিন্তু ইউরোপের সমাজ ও সভ্যতার উপর ধর্মযুদ্ধ গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মযুদ্ধ পশ্চিম ইউরোপের সমাজ জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। সামন্ত প্রথার আইন কানুন অনেক শিথিল হয়। ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অনেক ভূমিদাস দাসত্বের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে। শহর গড়ে ওঠা ও শিল্পের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভূমিদাস নতুন খামার থেকে পালিয়ে

গিয়ে নতুন আশ্রয় ও নতুন জীবিকার সন্ধান পায়। এই যুগ থেকেই পশ্চিম ইউরোপের নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য জমিদাররা দীর্ঘদিনের জন্য জমিদারীর বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং তাদের স্ত্রীরা জমিদারী পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুষ্ঠুভাবে এই দায়িত্ব পালন করার জন্য তারা সমাজে খুব সম্মানের স্থান অধিকার করার সুযোগ পায়।

ধর্মযুদ্ধের ফলে পশ্চিম ইউরোপের লোকদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। গ্রীক ও মুসলমানদের অনেক রীতি-নীতি তারা গ্রহণ করে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও প্রাচ্য দেশের প্রভাব পড়ে। প্রাচ্য দেশের খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র তারা পছন্দ করতে শুরু করে।

ধর্মযুদ্ধের সময় ইউরোপে নূতন শহর গড়ে ওঠে। শহরের অধিবাসীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও অনেক ভূমিদাসদের স্বাধীনতা লাভের ফলে অর্থ নৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। ইউরোপের খামারের উপর নির্ভরশীল সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতি ধীরে ধীরে নগর কেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে পরিণত হয়। সামন্ত ও জমিদারদের পরিবর্তে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং কলকারখানার মালিকরা বেশি সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জন করার সুযোগ লাভ করে। দেশের শাসকরাও শহরের গুরুত্ব ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রভাব স্বীকার করতে বাধ্য হয়। দেশের শাসনতন্ত্রেও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রভাব অনেক বেড়ে যায়।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাইরের জগতের সঙ্গে ইউরোপের কোন সম্পর্ক ছিল না। ফলে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতার উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধর্মযুদ্ধের সময় বাইরের জগতের সঙ্গে যোগা-যোগের ফলে আবার তাদের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। আরবের লোকেদের কাছ থেকে সংখ্যার ব্যবহার, বীজগণিত ও পাঠকদের কাছ থেকে কম্পাসের ব্যবহার জানার সুযোগ পায়। গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন জানার জন্য তাদের

আবার উৎসাহ জেগে ওঠে। এ্যারিস্টটলের রচনার সঙ্গে তাদের আবার নতুন করে পরিচয় ঘটে। মুসলমানদের উন্নত ধরনের চিকিৎসা-বিজ্ঞান তারা শিখতে চেষ্টা করে। এই সময়েই ইউরোপের লোকেরা প্রথম উইণ্ড মিল দেখার সুযোগ পায়।

ধর্মযুদ্ধের সময় থেকেই পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধ-কৌশলে পরিবর্তন দেখা দেয়। দুর্গে ব্যবহারের জন্য লোহার দরজা, নতুন ধরনের ধনুক, অশ্ব ও অশ্বারোহী যোদ্ধার জন্য ভারী বর্ম, গ্রীকদের আগ্নেয়াস্ত্র এবং সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য পায়রার ব্যবহার এই সময়ই ইউরোপে প্রচলিত ছিল।

ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের লোকদের ভৌগোলিক জ্ঞান অনেক পরিমাণে বাড়ে। প্রায় দু'শ বছর ধরে ইউরোপের পশ্চিম প্রান্ত থেকে হাজার হাজার লোক কনস্ট্যান্টিনোপলে যাতায়াত করে। ফলে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, রাস্তাঘাট, শহর-বন্দর, হাট-বাজার সম্পর্কে তারা সব কিছু জানার সুযোগ পায়। ভূমধ্যসাগরের মানচিত্র, তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণের সুবিধার জন্য অনেক বই, মোঙ্গল রাজদরবারের বিবরণ এই সময় প্রকাশিত হয়। অনেক পর্যটক বিভিন্ন দেশের নানাস্থান ঘুরে বেড়ান এবং নানারকম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এইসব পর্যটকদের মধ্যে মার্কোপোলোর নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন দেশ ও নানাজাতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ইউরোপের জনসাধারণের সংকীর্ণতা অনেক পরিমাণে দূর হয়। জেরুজালেম থেকে ফিরে এসে অনেকেই মাতৃভাষায় ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে শুরু করে। ফলে আঞ্চলিক ভাষারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। প্রাচ্যের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য রীতিও পশ্চিম ইউরোপের শিল্পের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

তৃতীয় পাঠ

নতুন শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র

ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে নতুন শহর গড়ে ওঠে এবং ইউরোপের বাণিজ্যক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। ধর্মযুদ্ধে

যোগ দেওয়ার জন্য দেশের রাজাদের অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অর্থের বিনিময়ে তাঁরা তখন নতুন নতুন শহরের স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য সনদ দিতে রাজী হন। এভাবে বিভিন্ন দেশে অনেক নতুন শহর গড়ে ওঠে। চার্চের প্রতিপত্তি গ্রাস করার উদ্দেশ্যেও রাজারা অনেক সময় নতুন শহর গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডি ও লয়ারের সব শহরই ধর্মযুদ্ধের সময় গড়ে ওঠে। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস অনেক নতুন শহরের সনদ মঞ্জুর করেন। ধর্মযুদ্ধের সময় সৈন্য চলাচলের সুবিধার জন্যও কয়েকটি নতুন শহরের পত্তন হয়। এই সব শহরের মধ্যে আইগুয়েস্ মোর্তেসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সৈন্যদের চলাচলের সুবিধার জন্য ফ্রান্সের রাজা নবম লুই ভূমধ্যসাগরের তীরে এই শহর গড়ে তোলেন। ধর্মযুদ্ধের সময়ই হামবুর্গ, ব্রিমেন, লিউবেক, অ্যাণ্টোয়ার্প, বার্জেস, ঘেণ্ট প্রভৃতি স্থান বাণিজ্য কেন্দ্র ও শহরে পরিণত হয়।

ইটালীর শহরগুলোই ধর্মযুদ্ধের সময় ইউরোপের বাণিজ্যক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পরিবর্তন আনে। একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভেনিসের অধিবাসীদের অ াড্রিয়াটিক সমুদ্র থেকে স্লাভ জলদস্যুদের বিতাড়িত বাণিজ্য করে। ক্ষেত্রের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বদেয় পরাজিত করে ভেনিস কিছুদিনের মধ্যেই তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ নিরাপদ করে তোলে। ইটালীর আর দু'টি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল জেনোয়া ও পিসা। ধর্মযুদ্ধের ফলে ভেনিস, জেনোয়া, পিসা ভূমধ্যসাগর ও ইজীয় সাগ রের উপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব স্থাপন করে। কৃষ্ণসাগরের পথে সিরিয়া, প ালেস্টাইন, ও কনস্ট্যাণ্টিনোপলের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দরের সঙ্গেও তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পশ্চিম ইউরোপের নর্ম্যাণ্ডি, ইংল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশেও নতুন নতুন বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ফ্ল্যাণ্ডার্স, ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি বড় বড় বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে ইউরোপের সর্বত্র পণ্যদ্রব্য ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। উত্তর সাগর, বাল্টিক সাগর, কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী

বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোই একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বাণিজ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

কৃষি ও কুটীর শিল্প ঃ মধ্যযুগের প্রথম দিকে ইউরোপের অর্থনীতি পুরোপুরি কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। খামারের বাসিন্দারা নিজেদের প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র নিজেরা তৈরি করে নিত। কিন্তু ধীরে ধীরে কৃষির উপর নির্ভরশীল অর্থনীতিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলে শহর গড়ে ওঠার ফলে অর্থনীতির কাঠামো সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। শহরের লোকদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নতুন নতুন কুটীর-শিল্প গড়তে শুরু করে। এইসব শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শুধু কুটীর-শিল্পের উপর নির্ভর করেই একদল লোক তাদের জীবিকার্জন করার সুযোগ পায়। এইসব শিল্পের কারিগরদের জীবিকার্জন করার জন্য আর কৃষির উপর নির্ভর করতে হত না। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই কুটীর-শিল্প কৃষি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ে।

অনুশীলনী

১। ধর্মযুদ্ধের কারণ ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে কি জান?

৩। ইউরোপের সমাজ ও সভ্যতার উপর ধর্মযুদ্ধের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের কিভাবে নূতন শহরের সৃষ্টি হয়?

৫। ধর্মযুদ্ধের পরবর্তীকালে কৃষিও কুটীর-শিল্পে কিরূপ পরিবর্তন দেখা দেয়?

৬। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) ধর্মযুদ্ধে যোগদানকারীদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি জান?

(খ) ধর্মযুদ্ধের ফলে পোপের ক্ষমতা কিভাবে বৃদ্ধি পায়?

(গ) ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের লোকের ভৌগোলিক জ্ঞান কিভাবে বৃদ্ধি পায়?

(ঘ) ধর্মযুদ্ধের পরে ইউরোপের সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানে কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

(ঙ) ধর্মযুদ্ধের পর ইউরোপের কোন্ কোন্ অঞ্চলে কি কি শহরের পত্তন হয়?

নবম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

শহরের উৎপত্তি

শহরের উন্নতিতে ধর্মযুদ্ধের দান

একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে রোমান আমলের পুরানো শহরে অথবা সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় বহু লোকজন বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যেই এইসব জায়গায় নতুন শহর গড়ে ওঠে। অনেক সময় বিশপদের চার্চ, সামন্তদের দুর্গ অথবা সন্ন্যাসীদের মঠকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে থাকে। কোথাও কোথাও সামরিক ঘাঁটি বা বাণিজ্যবন্দরকে কেন্দ্র করে শহরের পত্তন হয়। যোগাযোগের সুবিধার জন্য শহরগুলো সাধারণতঃ নদীর তীরে অথবা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য বন্দরের পাশে গড়ে উঠত। কৃষিকার্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলেও কখনও কখনও শহরের সৃষ্টি হত। এরা ছিল লোম্বার্ডির উত্তর অঞ্চলের মিলান, ইল দ্য ভেনিস, জেনোয়া ও পিসা, আইগুয়েস, মোর্তেস প্রভৃতি শহর। একাদশ শতাব্দীতে ইটালী ছাড়া অন্য দেশের শহরগুলো খুব ছোট ছিল। আয়তনে তারা ছিল বড়-গ্রামের মত। তবে কলোন, মেইন্‌জ, রিমগ্, লণ্ডন, ব্রিস্টল, নর-উইচ প্রভৃতি শহরের আয়তন তখনও অনেক বড় ছিল।

ধর্মযুদ্ধের সময় রাজা ও জমিদারদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রয়োজনের সময় অর্থ জোগান দিয়ে অনেক সমৃদ্ধ অঞ্চলের অধিবাসীরা স্থানীয় শাসকদের কাছ থেকে শহর গড়ে তোলার অনুমতি লাভ করত। সঙ্গে সঙ্গে স্বায়ত্ত-শাসনের অনুমতিও তারা লাভ করত। এইভাবে ধর্মযুদ্ধের সময় বিভিন্ন স্থানে বহু নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে। অনেক সময় বাণিজ্য-কেন্দ্রও ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হয়। হামবুর্গ, অ্যানটোয়ার্প, বার্জেস, ঘেণ্ট প্রভৃতি স্থানে ধর্মযুদ্ধের সময় বাণিজ্যকেন্দ্রও শহরে পরিণত হয়।

মধ্যযুগের শহর
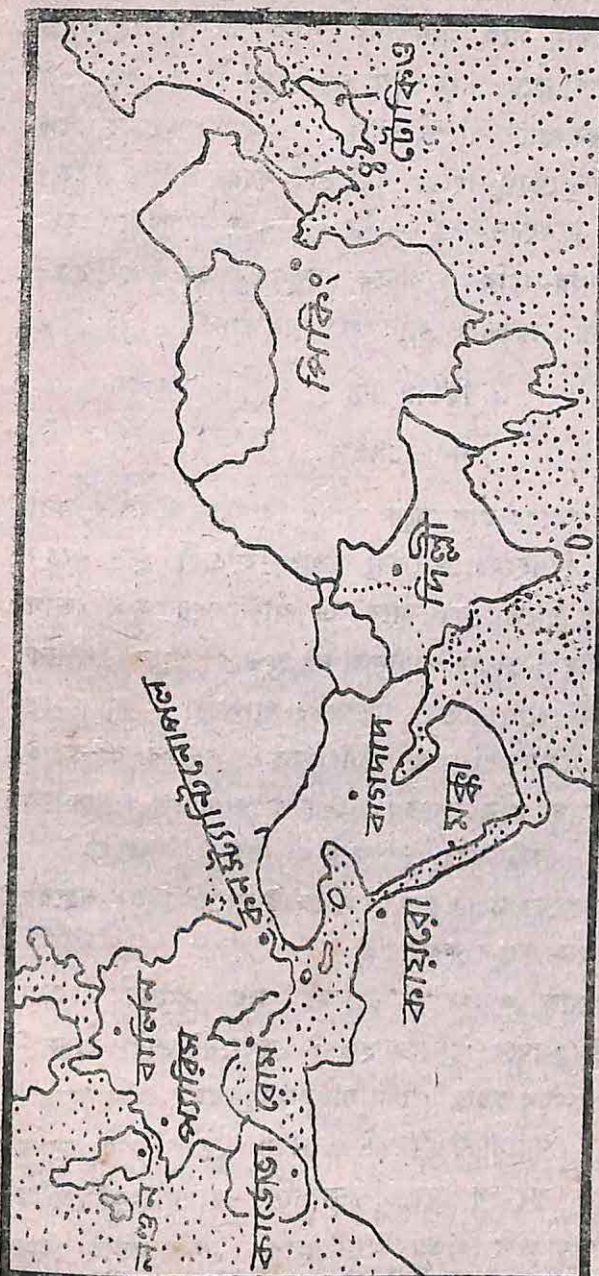
প্রথমদিকে অনেক শহরের আয়তনই ছোট ছিল। শহরের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক সেখানে এসে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। সেখানে নতুন নতুন শিল্পের পত্তন শুরু হয়। তখন শহরের আশে-পাশের স্থানে নতুন বাড়িঘর তৈরি হতে থাকে। এইভাবে প্রত্যেক শহরের চারদিকেই শহরতলি গড়ে উঠত। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ শহরতলি অঞ্চল শহরের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হয়ে যেত। আবার তার চারদিকে নতুন শহরতলি সৃষ্টি হত। এইভাবে শহরগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেত।

দ্বিতীয় পাঠ

বণিক্-সংঘ

রাজা বা জমিদারদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে অধিকার করা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শহরের লোকেরা অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠে। বাইরের লোকেরা যাতে কোনভাবে ঐ স্বাধীনতার অংশ ভোগ করতে না পারে, অথবা তাদের স্বাধীনতা নষ্ট হতে না পারে. সেদিকে তারা খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলত। নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই শহরের লোকেরা সংঘ গঠন করত। শহরের বণিক্‌রাই সাধারণতঃ এই সংঘ গঠন করত। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রত্যেক শহরেই একটি করে বণিক্-সংঘ ছিল। শহরের সব ব্যবসায়ীরাই এই সংঘের সদস্য হত। সংঘেরই নামেই রাজা শহরের জন্য প্রয়োজনীয় সনদ মঞ্জুর করতেন।

ব্যবসায় সংক্রান্ত ও অন্যান্য কাজের জন্য সংঘের সদস্যরা সাধারণতঃ একটি হলঘরে মিলিত হত। সেখানেই তারা ব্যবসা-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করত এবং নানারকম দাতব্য ও ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা তুলত। ব্যবসায়ে একচেটিয়া সুযোগ ভোগ করা, সমস্ত ব্যবসায়ীকে সমান সুযোগ দেওয়া, ক্রেতাদের কাছে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পণ্য পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন শিল্পের আরও উন্নতি করাই ছিল বণিক্-সংঘের উদ্দেশ্য। পণ্যদ্রব্যের উচ্চমান বজায় রাখার

জন্য বণিক-সংঘের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান মাঝে মাঝে পরিদর্শন করা হত।

শহরের সমস্ত ক্রয়-বিক্রয় পরিচালনা করা ছাড়াও শহরের শাসন ব্যাপারেও তারা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করত। শহরের অধিবাসীদের স্বার্থের দিকে তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখত। পণ্য-শুল্ক আদায় করা এবং সেতু, প্রাচীর, শহরের ফটক, নর্দমা প্রভৃতি তৈরি করার প্রত্যেকটি কাজই তারা দায়িত্ব নিয়ে করত। আবার দলবদ্ধ হয়ে ব্যবসায়ীরা যখন কোথাও বাণিজ্য করতে যেত, বণিক্-সংঘই তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত। বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তিপূর্ণ সমাজজীবনে শান্তিপূর্ণ-ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য একে অপরকে সাহায্য করাই ছিল বণিক্-সংঘের কর্তব্য।

প্রত্যেক বণিক্ সংঘেই তিন শ্রেণীর লোক থাকত—মালিক, মজুর বা ঠিকা লোক ও শিক্ষানবিশ। মালিক বা মজুররা সংঘের নির্বাচনে ভোট দিতে পারত। কিন্তু শিক্ষানবিশদের কোন ভোট ছিল না। মধ্যযুগের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা পণ্যদ্রব্যের মান উন্নত করার জন্য কতদূর আগ্রহী ছিল, তা শিক্ষানবিশদের নিয়োগের ব্যবস্থা থাকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যেত।

কারিগর সংঘ ঃ বিভিন্ন শিল্পের কারিগর বা শ্রমিকরা প্রথম দিকে বণিক্-সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু বণিক্দের অর্থ ও প্রতিপত্তি বেড়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তারা নানাভাবে শ্রমিকদের শোষণ করতে শুরু করে। শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে তারা কোনরকম দৃষ্টি দিত না। নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য তখন তারা পৃথক সংঘ গঠন করে। তবে সাধারণতঃ উত্তর ইটালী, রাইনল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি উন্নত ও বড় বড় শিল্প কেন্দ্রেই এরূপ সংঘ গড়ে ওঠে।

শহরের জীবনযাত্রা ঃ মধ্যযুগের শহরগুলোর লোকসংখ্যা খুব বেশি ছিল না। বড় বড় শহরে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার লোক বাস করত। তবে শহরের সব সময়ই ভিড় লেগে থাকত। শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রাও বিভিন্ন রকম ছিল। বড় বড়

ব্যবসায়ী ও অভিজাত ব্যক্তিরা বিরাট বিরাট বাড়ি তৈরি করত। তাদের জীবনযাত্রাও খুব বিলাসবহুল ছিল। অন্যান্য লোকেরা শহরের বাইরে অত্যন্ত সাধারণ ধরনের বাড়িতে বাস করত। মধ্যযুগে বেশির ভাগ শহরের রাস্তাই কাঁচা ছিল। ইটালীর শহরগুলোতে প্রথম পাকা রাস্তা তৈরি হয়। পরে জার্মানী ও ফ্রান্সের শহরগুলোতেও পাকা রাস্তা তৈরি হতে শুরু করে। শহরের নর্দমার ব্যবস্থাও ভাল ছিল না। রাস্তার উপরেই সব ময়লা জমা করা হত। ফলে পথচারীদের খুব অসুবিধা হত। প্রাকৃতিক কারণগুলি, যেমন—বৃষ্টির জল, নানারকমের পাখী এবং কুকুর রাস্তা পরিষ্কার করার দায়িত্ব পালন করত। জনসাধারণের জন্য কোন স্নানাগার ছিল না। অনেক বাড়িতেও স্নানাগার তৈরি করা হত না।

শহরে পরিশ্রুত জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শহরের অধিবাসীদের জলের জন্য পাতকুয়ার উপর নির্ভর করতে হত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও জলের অভাবের জন্য শহরে প্রায়ই প্লেগ প্রভৃতি মহামারী রোগ দেখা দিত এবং বহু লোক প্রাণ হারাত। সাধারণভাবেই মধ্যযুগে মৃত্যুর হার খুব বেশি ছিল। চার্চ বা মঠ ব্যতীত অন্য কোথাও আলোর ব্যবস্থা ছিল না, রাত্রিতে রাস্তায় আলো দেওয়ার কোন নিয়ম ছিল না। ফলে রাত্রিবেলা শহরে চোর-ডাকাতের খুব উপদ্রব ছিল। চোর-ডাকাতের ভয়ে শহরের লোকেরা সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ফটক বন্ধ করে দিত।

শহরের শাসন দায়িত্ব বড় বড় ব্যবসায়ী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে ছিল। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা সাধারণ লোক ও শ্রমিকদের উপর নানারকম অত্যাচার করত। ফলে শহর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংগ্রাম দেখা দেয়। ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে ও ১৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস ও ঘেণ্টে মালিক ও শ্রমিকদের সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে। মধ্যযুগে শহরকে কেন্দ্র করেই প্রথম ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রথম থেকেই চার্চ এই সমাজ-ব্যবস্থার কঠোরভাবে নিন্দা করে। তবে

চার্চের এই মনোভাব শহরের বড়লোকদের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

তৃতীয় পাঠ

রাজকীয় সনদ ও শহরের স্বায়ত্ত-শাসন

শহরের লোকদের স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি দেশের শাসকরা মোটেও পছন্দ করতে পারে নি। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিক লোম্বার্ডি অঞ্চলের বিভিন্ন শহরের স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি কঠোরভাবে দমন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে চার্চের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে রাজারা শহরের অধিবাসীদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস ন্যূনপক্ষে ৭৮টি নতুন শহরের সনদ দেন। অর্থের বিনিময়ে এবং প্রয়োজনের সময় সামরিক সাহায্য লাভের আশায় তিনি অনেক শহরের স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি মঞ্জুর করেন। ধর্মযুদ্ধের সময় রাজাদের প্রয়োজনীয় অর্থ দান করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বহু শহর স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার লাভ করে। শহরের অধিবাসী ও রাজাদের মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে শহরের শাসনের উপর রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য মেয়র প্রভৃতি কয়েকজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত করা হলেও শহরের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার মোটামুটি ভাবে রক্ষা করা হয়।

বুর্জোয়া: মধ্যযুগে সমস্ত শহরই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। এইসব প্রাচীর-ঘেরা শহরকে বার্গ বলা হত। শহরের লোকেরা প্রাচীর ঘেরা স্থানেই বাস করত। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরের মধ্যে বাসস্থানের অভাব দেখা দিতে শুরু করে। তখন অনেক শ্রমিক, ব্যবসায়ী, নানাধরনের লোক প্রাচীরের বাইরে বাড়ি-ঘর তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করে। শহরতলির এইসব বাসিন্দাকে 'ফৌবর্গস্' বলা হয়। শহরতলির অধিবাসীরা নিজেদের প্রাণ ও বিষয়সম্পত্তি নিরাপদ করে তোলার উদ্দেশ্যে তাদের বাসস্থান ঘিরে নতুন প্রাচীর তুলে দিত। কিন্তু একদল লোক ঐ নতুন প্রাচীরের

বাইরে আবার বাড়িঘর গড়ে তুলত। এইভাবে ধীরে ধীরে পুরানো শহরের চারদিকে দেওয়ালের পাশে নতুন শহরের সৃষ্টি হত। রীতি-নীতি, জীবিকা ও জীবনযাত্রায় পুরানো বার্গ বা পুরানো শহরের লোকদের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে এইসব শ্রেণীর লোকেরা সমাজে আর একটি নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি করে। এই নতুন শ্রেণীর লোকেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা 'বুর্জোয়া' নামে পরিচিত।

অনুশীলনী

১। ধর্মযুদ্ধের ফলে কিভাবে শহরের উৎপত্তি ও উন্নতি ঘটে?

২। বণিক্-সংঘ সম্পর্কে কি জান? কিভাবে বণিক্-সংঘ গড়ে উঠত ও পরিচালিত হত?

৩। শহরের লোকদের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল?

৪। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) শহরের কারিগর সংঘ সম্বন্ধে কি জান?

(খ) রাজাদের দেওয়া সনদের সাহায্যে কিভাবে শহরগুলোতে স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যবস্থা গড়ে ওঠে?

(গ) 'বুর্জোয়া' বলতে কি বুঝ?

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(ক) প্রথম দিকে অনেক শহরের আয়তনই — ছিল।

(খ) মধ্যযুগের শহরগুলোর — খুব বেশি ছিল না।

(গ) মধ্যযুগের সমস্ত শহরই — দিয়ে ঘেরা থাকত।

(ঘ) এই নতুন শ্রেণীর লোকেরা — বা — নামে পরিচিত।

(ঙ) শহরে — — সরবরাহের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

———

দশম অধ্যায়

মধ্যযুগে সুদূর প্রাচ্য : চীন

প্রথম পাঠ

তাং রাজবংশ (৬১৮-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ)

মধ্যযুগে চীনের সভ্যতা খুব উন্নতি লাভ করে। হানদের রাজত্বকাল চীনের মধ্যযুগের ইতিহাস প্রথম নবজাগরণের যুগ নামে পরিচিত। হান রাজবংশের রাজত্বকালেই চীনের সাম্রাজ্যের আয়তন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মধ্যযুগে সমগ্র চীন সাম্রাজ্যের আয়তনের আর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। হানদের পতনের পর কয়েকটি দুর্বল রাজবংশ চীনে রাজত্ব করে। তাদের সময় দেশে নানারকম গোলোযোগ দেখা দিলেও চীনের সভ্যতার অগ্রগতি কোনোপ্রকারেই নষ্ট হয় নি। বিশেষতঃ শক্তিশালী তাং-রাজবংশ ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সিংহাসন অধিকার করার পরই চীনের সভ্যতা আরও উন্নত হয়। এজন্য তাং-রাজবংশের রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসে দ্বিতীয় নবজাগরণের যুগ নামে পরিচিত।

তাং-রাজবংশ চীনে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। দুর্বল রাজাদের আমলে চীন সাম্রাজ্যের অনেক অঞ্চল স্বাধীনতা লাভ করেছিল। তাং রাজারা আবার সেইসব অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ফলে চীনে আবার রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। তাং-দের আমলে হোয়াংহো, ইয়াংসি, ওশি নদীর অববাহিকার সমগ্র অঞ্চল চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সিনকিয়াং অথবা চীনা তুর্কীস্থানের অধিকাংশ অঞ্চলও তাং-সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাং-রাজাদের আমলে চীন দেশই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য ছিল। হোয়াংহো'র শাখানদী ওয়েই তীরে চাঙ্‌আন্‌ শহরে তাংদের রাজধানী ছিল। শাসনের সুবিধার জন্য তাংদের রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশগুলো কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। তাং-রাজবংশের দ্বিতীয় সম্রাট তাই-সুং ৬২৭ থেকে ৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীন শাসন করেন।

দ্বিতীয় পাঠ

আইন-শৃঙ্খলা সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি

চীনদেশে শুধু রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেই তাং-রাজবংশ সন্তুষ্ট হয় নি। দীর্ঘকাল রাজনৈতিক অরাজকতার ফলে দেশের শাসনতন্ত্র দুর্বল এবং আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। তাং রাজারা আবার শক্তিশালী শাসনতন্ত্র গড়ে তোলে। প্রয়োজন অনুসারে নানারকম পরিবর্তন করে দেশের-প্রচলিত আইন কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চা: তাং-রাজবংশের রাজত্বকালে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শক্তিশালী শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্যও শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতন করে ঢেলে সাজানো হয়। সরকারী চাকুরির জন্য এই সময় থেকেই চীনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্তন হয়। রাজধানী চাঙ্-আনেতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেখানে প্রায় আট হাজার ছাত্র পড়াশুনা করত। সরকারী চাকুরিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হত। তবে চীনের শিক্ষাপদ্ধতির মারাত্মক ত্রুটি ছিল। কনফুশিয়াসের রচনার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ছাত্ররা অত্যন্ত গোঁড়া হয়ে উঠত। রাজকর্মচারীরা দক্ষ ছিল, তবে তারা ছিল সকল প্রকার প্রগতি বিরোধী।

সাহিত্য: চীনের সাহিত্য থেকেও তাং যুগের উন্নত সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের মধ্যে এই যুগে চীনের কবিতা ও কাব্যই সবচেয়ে বেশি উন্নতি লাভ করে। প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা চীনের এই যুগের গীতি-কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিউ সুং য়ুয়ান এবং তুসু। এঁরা ছিলেন তাং যুগের দুজন প্রধান কবি। লিউ সুং য়ুয়ানের রচিত "মিডনাইট ইন দি গার্ডেন" নামে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য।

চা: চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দেই পানীয় হিসাবে চীনদেশে চায়ের প্রচলন প্রথম শুরু হয়। পরে ধীরে ধীরে চা চীনের সর্বত্রই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাইরের দেশেও প্রচুর চা রপ্তানি শুরু হয়।

মুদ্রণ শিল্প : তাং যুগে চীনে ছাপার কাজ বা মুদ্রণ-শিল্প খুব উন্নত হয়। চীনই সর্বপ্রথম মুদ্রণ-যন্ত্র এবং সস্তায় ও অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর বই ছাপানোর উপায় আবিষ্কার করে। তাং-যুগে কাগজ, কালি ও ছাপার কাজ আরও উন্নত হয়। ব্লক করে ছবি ছাপার পদ্ধতিও চীনে তখন আবিষ্কৃত হয়। ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রোল করা প্রায় ষোল ফুট লম্বা কাগজ একসঙ্গে ছাপাবার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর থেকেই ওইভাবে চীনের প্রাচীন সব গ্রন্থ ছাপা শুরু হয়। কিছুদিন পরে কাগজের নোট ও খেলার তাসও ছাপান আরম্ভ হয়। চীনে আবিষ্কৃত এই মুদ্রণ পদ্ধতি প্রথম আরব অঞ্চলে এবং পরে ইউরোপের দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে।

শিল্পকলা : তাং-যুগে চীনের অঙ্কন শিল্প সবচেয়ে উন্নতি লাভ করে। অঙ্কন বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চীনে হাতে লেখার পদ্ধতিতেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। আঁকার বিষয়বস্তুর বাস্তবরূপ ছবিতে ফুটিয়ে তোলাই ছিল চীনের অঙ্কন-শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাং-যুগে চীনের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। তবে বাইরের দেশের প্রভাবেই তাং যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্প উন্নতি লাভ করার সুযোগ পায়। চীনে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিল্পকলাও চীনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া চীনের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে একদিকে চীনের মানুষের ধর্মীয় মনোভাব আর একদিকে বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আক্রমণকারীদের হাত থেকে শহর রক্ষার জন্য উচ্চ প্রাচীর, মজবুত ফটক প্রভৃতি তৈরির দিকে তাদের বেশি ঝোঁক ছিল। তবে এই যুগের প্যাগোডাগুলোই চীনের সবচেয়ে সুন্দর শিল্পের নিদর্শন।

তৃতীয় পাঠ

ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি

তিয়েনসান, কুনলুন ও হিমালয়ের পর্বতের জন্য চীনের পক্ষে মধ্য-এশিয়া ও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা বেশ কঠিন

ছিল। মধ্য-এশিয়ার মরু অঞ্চলেও স্বাভাবিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করত। কিন্তু এত সব বাধা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চীনের তৈরি একটি ব্রোঞ্জ পাত্র পাওয়া গিয়েছে। রোমে চীনের রেশম বস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল। চীন থেকে অনেক রকম মশলা বিভিন্ন দেশে পাঠানো হত।

তাং-রাজাদের রাজধানী চাঙ্-আন থেকে জলপথে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। উই ও হোয়াংহো নদীর পথ ধরে পশ্চিমের বহু দেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য চলত। খোটান, ইয়ারখন্দ, কাশগড়, সমরখন্দ, ব্যাকট্রিয়া, অ্যান্টিয়োক প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য গড়ে উঠে। কাশগড়ের পথেই পেশোয়ার এবং গঙ্গার অববাহিকা হয়ে চীনের পণ্যদ্রব্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এসে পৌঁছাত। ভারতের পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন বন্দরের সাহায্যে চীনের সঙ্গে সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

তাং রাজাদের সময় চীনের কৃষিও বিশেষ উন্নতি লাভ করে। কৃষির উন্নতির জন্য বিভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়ে জল আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক নতুন খালও কাটা হয়। জলসেচ ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি করা হয়। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কৃষির উন্নতির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নানাভাবে সাহায্য করা হত।

চীনে বৌদ্ধধর্ম : বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা মধ্য-এশিয়া থেকেই চীনদেশে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ পায়। ভারতের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এইসব স্থানে ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট কণিষ্কের সময় মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে চীনের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে চীনের অনেক লোক বৌদ্ধ-

ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্ম প্রচারের জন্য মধ্য এশিয়া থেকে কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও চীনে যান। তাঁদের চেষ্টায় চীনে বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং মূল বৌদ্ধধর্ম-শাস্ত্র পাঠ করার জন্য চীনের বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও ভারতে আসেন। তাঁদের মধ্যে ফা হিয়েন ও হিউয়েন-সাঙের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করার জন্যও চীনের বহু লোক ভারতে আসত। এইসব তীর্থযাত্রী ও পণ্ডিতদের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম প্রায় চীনদেশের সর্বত্রই বিস্তার লাভ করার সুযোগ পায়। পরে চীন দেশ থেকেই বৌদ্ধধর্ম জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয়।

চতুর্থ পাঠ

জাপান, কোরিয়া, আনাম প্রভৃতি দেশে চীনের সভ্যতার বিস্তৃতি

তাং-রাজবংশের আমলে চীনের সঙ্গে জাপান, কোরিয়া, আনাম প্রভৃতি দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সময় চীনের সভ্যতা জাপান, কোরিয়া, আনাম প্রভৃতি দেশের সভ্যতার সঙ্গে যথেষ্ট মিল ছিল। চীনের সভ্যতার আদর্শে এইসব দেশই নিজেদের সভ্যতাকে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। চীন দেশ থেকেই এইসব অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। চীন থেকে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এইসব অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে যান। তাঁদের সংস্পর্শে এসে জাপান, কোরিয়া, আনাম প্রভৃতি অঞ্চল শুধু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট হয়নি, চীনের পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধূলা, রান্নার পদ্ধতি—সব কিছুই এইসব দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। চীনের লিখন-পদ্ধতি, সাহিত্য, কাব্য ও কবিতা এবং সঙ্গীত এইসব অঞ্চলের লোকেরা অনুকরণ করতে শুরু করে। চীনের শাসন-পদ্ধতির অনুকরণেই তারা তাদের দেশের শাসন-পদ্ধতি গড়ে তোলে। এইসব দেশের শিল্প ও স্থাপত্য, ভাস্কর্যের উপর চীন সভ্যতা গভীরভাবে বিস্তার লাভ করে। জাপানের রাজধানী নারা ও কিয়োতো চাঙ্-আন শহরের অনুকরণে তৈরি করা হয়।

পঞ্চম পাঠ

হিউএন-সাঙের ভারত ভ্রমণ ও চীনে প্রত্যাবর্তনের ফলাফল

৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ বছর বয়সে চীন সম্রাট তাই-সুঙের রাজধানী সিয়ান-ফু থেকে হিউএন-সাঙ ভারতের পথে যাত্রা করেন। তখন উত্তর ভারতের সম্রাট ছিলেন হর্ষবর্ধন। তিনি তাসখন্দ, সমরখন্দ, কাশগড় প্রভৃতি স্থান ঘুরে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধার দিয়ে সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজ্যে প্রবেশ করেন। দীর্ঘ তের বছর তিনি ভারতে বাস করেন।

তারপর আবার কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান হয়ে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনে পৌঁছান। ভারতে থাকার সময় তিনি এই দেশের প্রায় সব উল্লেখযোগ্য স্থানে বেড়াতে যান। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর ভারত অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে একখানা বই লেখেন। হিউ-এন-সাঙের ভ্রমণ কাহিনী চীনা সাহিত্যের একখানি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ।

এই ভ্রমণ-লিপি থেকে ভারতের ধর্ম, সমাজ, শাসনরীতি প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

ভারত ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরে যাওয়ার পর হিউএন-সাঙের প্রতি খুব সম্মান দেখান হয়। যেদিন তিনি সিয়ান-ফু পৌঁছুলেন, সেদিনটি সমস্ত চীনদেশে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হয়। নানা রঙের ফুল ও সুন্দর সুন্দর পতাকা দিয়ে রাজপথ সুসজ্জিত করা হয়। অনেক জায়গায় নাচ-গানেরও ব্যবস্থা ছিল। খুব জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিউএন্-সাঙকে রাজধানীতে প্রবেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়।

ভারত থেকে হিউএন-সাঙ প্রচুর বৌদ্ধগ্রন্থ, বৌদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধদেবের ব্যবহৃত বহু জিনিসপত্র দেশে নিয়ে যান।

সম্রাট তাই-সুং নিজে এসে হিউএন-সাঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান এবং তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেন। ভারত সম্পর্কে সম্রাট হিউএন-সাঙকে বহু প্রশ্ন করেন। কিন্তু হিউএন-সাঙ শুধু বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম সম্পর্কেই সম্রাট তাই-সুং-এর খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু কোন ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। তিনি জানতেন যে প্রত্যেক ধর্মেরই মূলকথা এক। হিউ-এন সাঙের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের কাজে লাগাবার জন্য তিনি তাঁকে সরকারী কাজে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু হিউএন-সাঙ সম্রাটের এই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হলেন না। তখন সম্রাট তাঁকে ভারতের লোকরা যাতে চীনের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, সেজন্য লাওসের রচনা

হিউ এন-সাঙ

সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু হিউ এন-সাঙ সম্রাটের এই অনুরোধও রক্ষা করলেন না। তিনি বাকি জীবন একটি মঠে কাটিয়ে দেন এবং বৌদ্ধধর্মের বহু গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। হিউএন-সাঙের এই কাজের ফলে বৌদ্ধধর্ম চীন-দেশে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ষষ্ঠ পাঠ

সুঙ্ রাজবংশ (৯৬০—১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ)

ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব

৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাং রাজবংশের পতন হয়। তারপর কিছুদিন চীনের রাজনীতিতে অরাজকতা চলে। ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাই সুন্নামে এক বীরযোদ্ধা সুঙ্ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সুঙ্দের আমলে চীনে আবার গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই-খান চীন অধিকার করলে সুঙ রাজত্বের অবসান হয়।

সুঙ্ রাজাদের আমলে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি খুব উন্নতি লাভ করে। দেশের লোকসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তবে চীনের এই সমৃদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন ওয়াং অ'ন-সি নামে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। সরকারী কাজে যোগ দেওয়ার পরই তিনি প্রচলিত শাসননীতির অনেক পরিবর্তন করেন। তিনি মনে করতেন যে দেশের জনসাধারণের মঙ্গল সাধন করাই সরকারের প্রধান কর্তব্য। জনসাধারণের স্বার্থেই রাষ্ট্রের, দেশের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তা নাহলে দেশের ধনী ব্যক্তিরা শ্রমিক ও গরীবদের নানাভাবে শোষণ করবে। শ্রমিকদের বেগার খাটানর প্রথা বহুদিন ধরেই চীনে চালু ছিল। তিনি এই প্রথা কঠোরভাবে বন্ধ করেন। বেগার প্রথা বন্ধ করা সত্ত্বেও তিনি বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক বড় বড় পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার ব্যবস্থা করেন। সুদখোর মহাজনদের হাত থেকেও তিনি গরীব কৃষকদের রক্ষা করেন।

অল্প সুদের হারে তিনি রাজকোষ থেকে তাদের টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। ফসল ঘরে তোলার পর ঋণ শোধ করবে—এই শর্তে তিনি বেকারদেরও রাজকোষ থেকে অর্থ, প্রয়োজনীয় বীজ ও কৃষির সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করতেন। শ্রমিকদের বেতন ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে বোর্ড গঠন করা হত।

সরকারই দেশের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করত। সমস্ত খাদ্যশস্য সরকারের পক্ষ থেকে কিনে নেওয়া হত। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য প্রচুর খাদ্যশস্য সঞ্চয় করে রাখা হত। বাকি খাদ্যশস্য প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন স্থানে পাঠাবার ও সরকারী দোকান থেকে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হত। সরকারী আয়-ব্যয়ের ঠিক ঠিক হিসাব রাখার জন্য একটি বাজেট কমিশন নিয়োগ করা হত। শাসনতন্ত্রের কোনও বিভাগেরই এই কমিশনের বরাদ্দ টাকার চেয়ে বেশী টাকা ব্যয় করার অধিকার ছিল না। সরকারী বিভাগগুলো এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হবার ফলে জনসাধারণের বহু অর্থ অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। বৃদ্ধ, বেকার ও গরীবদের পেনসন দেওয়ারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সুঙ্-রাজবংশের আমলেই চীনে সম্পত্তি কর আদায় কবার ব্যবস্থা করা হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ সুঙ্‌দের রাজত্বকালে শিক্ষাপদ্ধতিরও অনেক সংস্কার করা হয়। এই সময় থেকেই সাহিত্য, কনফুসিয়াসের দর্শন, ধর্মীয় অনুষ্ঠাদের রীতি-নীতি এবং মুখস্থ বিদ্যার উপর কম জোর দেওয়া শুরু হয়। শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষার নিয়ম-কানুনেরও পরিবর্তন করা হয়। ছাত্রদের জন্য ইতিহাস, ভূগোল, অর্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় অবশ্য পাঠ্যরূপে গণ্য হতে থাকে। শিক্ষা-জগতের এই পরিবর্তন চীনের সংস্কৃতির উপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্য শিল্প, দর্শন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে সুঙ্ যুগে চীন খুব উন্নত হয়ে ওঠে।

সপ্তম পাঠ

য়ুয়ান রাজবংশ (১২৮০-১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দ)

মধ্য-এশিয়ায় মোঙ্গল জাতি বাস করত। হূণদের মত মোঙ্গলরাও ছিল যাযাবর। হূণদের অপেক্ষা তারা অনেক বেশী নৃশংস ছিল। তবে তাদের একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা পরাজিত জাতির সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিজেদের উন্নত করে তোলার চেষ্টা করত। প্রথমে তারা আমুর ও হোয়াংহো নদীর মাঝামাঝি বর্তমান মোঙ্গলিয়া অঞ্চলে বাস করত; পরে নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করে পারস্য, ভারত, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। মোঙ্গলদের আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই চীনের ঐ সুবৃহৎ প্রাচীর তৈরি করা হয়। মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের আমলে মোঙ্গলদের বিভিন্ন দলের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠে। চেঙ্গিস খানের আমলেই মোঙ্গলরা পিকিং ও তার চারধারে নিজেদের অধিকার স্থাপন করে। ধীরে ধীরে চীনে মোঙ্গলদের রাজত্ব গড়ে ওঠে। ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খান চীনদেশের কিছু অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে চীনের ঐতিহাসিকরা কুবলাই খানকে চীনের সম্রাটরূপে বর্ণনা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ য়ুয়ান রাজবংশ নামে পরিচিত। ১২৮০ থেকে ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত য়ুয়ান রাজবংশ চীনে রাজত্ব করে।

কুবলাই খান

কুবলাই খান : ১২৫৯ থেকে ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কুবলাই খান চীনে রাজত্ব করেন। তিব্বত ও দক্ষিণ চীন তিনি অধিকার করেন। কুবলাই খানের আমল থেকেই মোঙ্গরা চীনেরা সভ্যতা গ্রহণ করে। তাদের স্বভাবের অনেক পরিবর্তন হয়। লুট-পাট, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি ধ্বংসলীলা তারা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে। কুবলাই খানের রাজধানী ছিল ক্যাম্বুল্যাক। ক্যাম্বুল্যাকের বর্তমান নামই হল পিকিং। কুবলাই খানের রাজসভা জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ নানারকম অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। মোঙ্গলদের সুশাসনের ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প খুব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নতুন নতুন বহু বাণিজ্য-কেন্দ্র ও শহরের পত্তন হয়। এই সময় থেকেই চীনের সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিব্বতের লোকেরাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে।

অষ্টম পাঠ

মার্কোপোলোর বিবরণ

১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর ভেনিস ও জেনোয়ার মধ্যে এক নৌ-যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভেনিসের সাত হাজার সৈন্য জেনোয়ার কাছে বন্দী হয়। বন্দীদের মধ্যে ভেনিসের বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কো-পোলোও ছিলেন। বন্দী-জীবনের একঘেয়েমির সময় কাটাবার জন্য তাঁর দেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে তিনি একখানি বই লেখেন। বইটির নাম

মার্কোপোলো

মার্কোপোলোর ভ্রমণ কাহিনী। মার্কোপোলোর ভ্রমণ-কাহিনী পৃথিবীর

অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ। মার্কোপোলোর বই পড়েই ইউরোপের লোকেদের প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ বেড়ে যায়।

মার্কোপোলোর পিতা নিকোলো পোলো ও খুড়া মাফিয়া পোলোর চীনে যাওয়ার কাহিনী অবলম্বনে বইখানি লেখা। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁরা ক্রিমিয়া ও বোখারায় যান। বোখারায় তাঁদের সঙ্গে কুবলাই খানের কয়েকজন অনুচরের পরিচয় ঘটে। তাদের অনুরোধে নিকোলো ও মাফিয়ো কুবলাই খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য চীনে যান। তাদের কথাবার্তা ও ব্যবহারে কুবলাই খান খুব তুষ্ট হন এবং খ্রীষ্টানদের সভ্যতার প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি চীনে খ্রীষ্টধর্ম ও ইউরোপের সভ্যতা প্রসারের উদ্দেশ্যে শিক্ষিত ও উপযুক্ত একশ জন লোক পাঠাবার জন্য পোপকে অনুরোধ করেন। কুবলাই খানের দূত হিসাবে

নিকোলো ও মাফিয়ো রোমে পোপের নিকট উপস্থিত হন। তখন রোমে খুব বিশৃঙ্খলা চলছিল। ফলে দু'বছর অপেক্ষা করার পর মাত্র দু'জন ধর্মপ্রচারক সঙ্গে নিয়ে তাঁরা আবার চীনে রওনা হন। নিকোলোর পুত্র মার্কোপোলো এবার তাঁদের সঙ্গী হন।

মার্কোপোলো অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও চালাক-চতুর ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাতারদের ভাষা শিখে ফেলেন। কুবলাই খানও তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি তাঁকে সরকারী কাজে নিযুক্ত করেন। সরকারী কাজে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় কিছুদিন থাকতে বাধ্য হন। এই অঞ্চলের শস্য-শ্যামল প্রান্তর, ফুল ও ফলের বাগান, অতিথির প্রতি জনসাধারণের সদ্ব্যবহার, মূল্যবান অলঙ্কার ও সুন্দর পোশাকে সজ্জিত নর-নারী এবং নানা কারুকার্য-করা অসংখ্য বৌদ্ধমঠ মার্কোপোলোকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

মার্কোপোলোর বর্ণনায় ব্রহ্মদেশেরও উল্লেখ আছে। হাজার হাজার ব্রহ্মদেশের সৈন্যবাহিনীকে অতি সহজে পরাজিত করে মোঙ্গলদের পেগু জয়ের কাহিনী তিনি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু জাপানের কথা আলোচনা করার সময় তিনি সে-দেশের ধন-সম্পদের কথা বড় বেশি অতিরঞ্জিত করেন। চীনের একদল খ্রীষ্টানদের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। মার্কোপোলো তিন বছরের জন্য ইয়াং-চো শহরের শাসনকর্তাও নিযুক্ত হন। চীনের দূত হিসাবে সম্ভবতঃ তিনি ভারতে আসেন। মার্কোপোলোর দেশে ফিরে যাওয়ার কাহিনীও খুব সুন্দর।

রোম থেকে চীনে পৌঁছতে মার্কোপোলো ও তাঁর সঙ্গীদের প্রায় সাড়ে তিন বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। তারপর ষোল বছরেরও বেশি সময় তাঁরা চীনে বাস করেন। কুবলাই খান তাঁদের খুব পছন্দ করতেন এবং নানাভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁদের এই সৌভাগ্য দেখে একদল লোকের মনে ঈর্ষা দেখা দেয়। মার্কোপোলো ও তাঁর সঙ্গীরা তা বুঝতে পারতেন এবং কুবলাই খান জীবিত থাকতেই তাঁরা চীন ত্যাগ করার জন্য চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু কুবলাই খান কোনমতেই তাঁদের ছেড়ে দিতে রাজি নন। কিন্তু হঠাৎ এই সময় একটা সুযোগ এসে যায়। পারস্যের মোঙ্গল সম্রাট আরাগণের রাণী মারা যান। মোঙ্গল ভিন্ন অন্য কোন জাতির মেয়ে তিনি বিয়ে করবেন না। একজন উপযুক্ত মেয়ে পাঠানোর জন্য তিনি পিকিংয়ে দূত

পাঠান। পারস্যের ভবিষ্যৎ রাণীর দেহরক্ষী হিসেবে বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী মার্কোপোলো ও তাঁর সঙ্গীরা পারস্য হয়ে দেশে ফেরার সুযোগ পান।

মার্কোপোলোর জাহাজ দক্ষিণ চীনের কোনো এক বন্দর থেকে পারস্যের পথে যাত্রা করে। সুমাত্রা, দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি স্থানে বহুদিন অপেক্ষা করার পর, প্রায় দু'বছর পরে তাঁরা পারস্যে এসে পৌঁছান। ইতিমধ্যে আরাগণ মারা যান। সুতরাং আরাগণের পুত্রের সহিত চীন থেকে আনা মেয়েটির বিয়ে হয়। রাজার বিয়ের পর মার্কোপোলো ও তাঁর সঙ্গীরা এবার স্বদেশে রওনা হন। তাব্রিজ ও কনস্ট্যান্টিনোপল হয়ে ১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা ভেনিসে পৌছেন।

ভেনিসে ফিরে এসেও তাঁরা বিপদে পড়েন। দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির ফলে সবাই তাঁদের ভুলে গিয়েছিল। বিশেষতঃ তাতারদের পোশাক পরা নিকোলো, মাফিয়ো এবং মার্কোকে বিদেশী পর্যটক বলে মনে করা হোত। কিন্তু পরে এক ভোজসভার আয়োজন করে তাঁরা যখন মহামূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরে সেখানে এসে হাজির হন, তখন সবাই তাদেরকে চিনতে পারে এবং সমাদরের সঙ্গে তাঁদের গ্রহণ করে। কিন্তু সব সময় তাঁরা লক্ষ লক্ষ লোক, লক্ষ লক্ষ টাকা প্রভৃতির গল্প করতেন বলে মার্কোপেলোকে সবাই আড়ালে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

মধ্যযুগে জাপান

প্রথম পাঠ

জাপানের সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি

মধ্যযুগের প্রথমদিকে জাপানের সমাজে আট শ্রেণীর লোক ছিল। কিন্তু পরে সামুরাই বা যোদ্ধা, কৃষক, কারিকর ও ব্যবসায়ী—এই চারটি শ্রেণী নিয়ে জাপানে সমাজ গড়ে ওঠে। ব্যবসায়ীদের

কোনরূপ সম্মান ছিল না। এই চারটি শ্রেণী ছাড়াও দেশে প্রচুর ক্রীতদাস ছিল। অপরাধী, যুদ্ধবন্দী, চুরি করে নিয়ে-আসা ছেলে-মেয়েও বাজারে বিক্রি-করা লোকেদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হত। সমাজে সবচেয়ে নীচু শ্রেণীর লোকেদের 'ইতা' নামে পরিচিত ছিল। ঝাড়ুদার, চর্মকার, কসাই প্রভৃতি ছিল এই শ্রেণীর লোক।

জাপানের সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। দেশের অর্থনীতি গড়ে-ওঠা সামন্ততন্ত্রের উপর নির্ভর করত। রাজা বা মিকাডো ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। জমিদাররা রাজার কাছ থেকে সব জমি ইজারা নিত। কৃষকরা জমি চাষ করত। সরকার থেকে জমির উন্নতি করার জন্য ঋণ দেওয়া হত। কিন্তু পাথুরে মাটিতে ফসল ফলাতে কৃষকদের খুব পরিশ্রম করতে হত। তাছাড়া প্রত্যেক কৃষক বছরে ত্রিশদিন করে জমিদারের জমিতে কাজ করতে বাধ্য থাকত। সেই সময় এক মুহূর্ত কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য তার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারত। বেগার-খাটা ছাড়াও কৃষককে নানাপ্রকার কর দিতে হত। মধ্যযুগে জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য খুব উন্নত ছিল না। জমির উৎপাদন ক্ষমতার উপর দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করত।

দ্বিতীয় পাঠ

মিকাডোর প্রাধান্য

জাপানের সম্রাট অনেক সুন্দর সুন্দর উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কখনো কখনো তাঁকে 'তেনসি' বা ঈশ্বরের পুত্র বলা হত। সাধারণ-ভাবে তাঁকে 'তেন্নো' বা স্বর্গীয় রাজা এবং কখনো কখনো মিকাডো বা পবিত্র তোরণ বলা হত। সাধারণভাবে রাজার বড় ছেলেই সিংহাসন পেতেন। রাজাই ছিলেন রাজ্যের সর্বেসর্বা। প্রজারা রাজাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। রাজাদের আগ্রহেই জাপানের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

চীনের সহিত জাপানের সম্পর্ক

৮৯৮ থেকে ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দাইগো ছিলেন জাপানের সম্রাট। তিনি অতিশয় জ্ঞানী ও গুণী ছিলেন। সম্রাট দাইগোর আমলেই চীনের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সময়েই জাপান তার সভ্যতাকে চীনের সভ্যতার চেয়েও উন্নত করার চেষ্টা করেছিল। চীন থেকেই বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রচারিত হত। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে চীনের সভ্যতা জাপানে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। চীনের পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলাধূলা, রান্নার পদ্ধতি, লেখন-পদ্ধতি, মৃৎশিল্প ও শাসন পদ্ধতি জাপানের লোকেরা অনুসরণ করতে থাকে। জাপানের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্পের উপরও চীনের প্রভাব পড়ে।

চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে-ওঠার ফলে জাপানের রাজ-নীতিতেও পরিবর্তন দেখা যায়। চীনের মত জাপানেও স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার গড়ে ওঠে। জাপানের ইতিহাসে এই যুগ 'সুবর্ণময়' নামে পরিচিত। শিল্প, সাহিত্য, অঙ্কন-বিদ্যা—প্রতিটি বিষয়েই জাপান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও খুব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

প্রভাবশালী জমিদার পরিবারের উত্থান : জাপানের অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবারের জাঁকজমক ও আড়ম্বর যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বিনা কারণে প্রচুর অর্থব্যয়ের ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। রাজশক্তি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্রমে দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অপরাধ ও অপরাধীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এই অরাজকতার সুযোগ নিয়ে একদল সামরিক নেতা বিভিন্ন স্থানে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এইসব সামরিক নেতারা 'সগুন' নামে পরিচিত। রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। রাজার ক্ষমতা তারা সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে এবং রাজাকে শুধু ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকার করতে ও সম্মান দিতে রাজি হয়। রাজা ও রাজ-পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে তারা স্বীকার করে।

দুর্বল রাজা কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করতে অক্ষম হলে, কৃষকরা রাজার পরিবর্তে সগুনদের বা সেনাপতিদের কর দিতে শুরু করে; কারণ একমাত্র সেনাপতিরাই দস্যুদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে পারত।

১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মিনামোতো গোষ্ঠীর নেতা য়োরিতোমো সামরিক শক্তির দক্ষতায় সমগ্র জাপানের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। রাজাও তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেন। কিন্তু ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে য়োরিতোমোর মৃত্যুর পর হোজো পরিবার জাপান, জাপানের অন্যান্য সগুন ও সম্রাটের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। এইসময় কুবল ই খান জাপান আক্রমণ করেন। কিন্তু জাপান জয় করতে তিনি ব্যর্থ হন। ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হোজোদের শাসনের যুগের অবসান হয়। হোজো গোষ্ঠীর শেষ শাসক তাকাতোকির দুর্বলতার সুযোগে জাপসম্রাট গোদাইগো আবার রাজার ক্ষমতা পুনরুত্থানের চেষ্টা করতে শুরু করেন। হোজোদের প্রতিদ্বন্দ্বী মিনামোতো ও আসিকাগা গোষ্ঠীর সগুনরা রাজাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হন। তাকাতোকি ও তাঁর ৮৭০ জন সামন্ত হারাকিরি করেন। তাকাতোকির মৃত্যুর পর আসিকাগা তাকাউজি রাজার বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং গোদাইগোকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে নিজের পছন্দমত রাজা কোগোনকে সিংহাসনে বসান। আসিকাগা গোষ্ঠীর সগুনরা প্রায় ২৫০ বছর জাপান শাসন করে। তাদের শাসনকালে দেশে যখন অশান্তি দেখা দেয়, তখন নোবুনাগা, হিদেয়োসি এবং ইয়েয়াসু নামে তিনজন জলদস্যু জলপথে আবার জাপানে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপন করে। ইয়েয়াসুর নেতৃত্বে জাপানে টকুগাওয়া গোষ্ঠীর শাসন শুরু হলে দেশে পুনরায় শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসে।

নোবুনাগা, হিদেয়োসি এবং ইয়েয়াসুর সাহায্যে সগুনদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মিকাডোর রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেন। তিনি নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাপানের

শিণ্টো ধর্মের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। শিণ্টোই ছিল জাপানের অধিবাসীদের প্রধান ধর্ম। তারপরই ছিল বৌদ্ধধর্মের স্থান।

প্রজাদের সমর্থন লাভ করার উদ্দেশ্যে মিকাডো নিজে শিণ্টো ধর্মের প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি ধর্মীয় প্রভাব কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক শান্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। প্রজাদের সাহায্যে সগুনদের বিতাড়িত করে নিজেকে সর্বশক্তিমান সম্রাটরূপে ঘোষণা করার কথাও চিন্তা করেন। কিন্তু রাজশক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখে জাপানের বিভিন্ন সামরিক গোষ্ঠী অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও রাজার শক্তি বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টাকে খুব সুনজরে দেখেনি। হিদেয়োসির শাসনকালে মিকাডো নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার সুযোগ পান। কিন্তু ইয়েয়াসু খুব দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি সম্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখতেন। দেশের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদেরও এই সম্পর্কে তিনি সতর্ক করে দেন। ইয়োয়াসুর উত্তরাধিকারীরাও তাঁর এই নীতি অনুসরণ করত এবং সম্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধির কোন সুযোগই দেয় নি। অন্যান্য গোষ্ঠীর নেতারাও এই ব্যাপারে সগুনদের সাহায্য করত।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও রাজশক্তি বৃদ্ধির বিরোধী ছিলেন। বিশেষতঃ সম্রাট শিণ্টোধর্মের প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। নিজেদের স্বার্থ, বিষয়-সম্পত্তি ও ধর্মের প্রাধান্য রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজার বিরোধিতা করতে শুরু করে। রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠীর ও প্রতিপত্তি-শালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিরোধিতার ফলে সম্রাটের পক্ষে ক্ষমতা বৃদ্ধি করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি রাজধানী কিতোর রাজপ্রাসাদে প্রায় বন্দীজীবন কাটাতে বাধ্য হন।

তৃতীয় পাঠ

সগুন

সম্রাটের ক্ষমতা খর্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সগুনদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। ধীরে ধীরে রাজার সমস্ত ক্ষমতাই তাদের অধিকারে চলে যায়। বলদ-টানা গাড়ী চড়ে অথবা পাল্কী করে তিনি যখন কোথাও যেতেন, তখন রাজপথের দুপাশে সতর্ক প্রহরী মোতায়েন থাকত। রাস্তার দুপাশের সমস্ত বাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত। কোন বাড়িতেই তখন কেউ আগুন জ্বালাতে পারত না। কুকুর বিড়ালকেও লোকে আটকে রাখত। আর সমস্ত লোক হাঁটু গেড়ে বসে, মাটিতে হাত রেখে, মাথা নীচু করে থাকতে বাধ্য ছিল।

এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সগুনদের দেহরক্ষীর কাজ করত। সগুনদের মনোরঞ্জন করার জন্য বারজন ভাঁড় এবং আটজন শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির ভদ্রমহিলা সবসময় তাঁর সঙ্গে থাকত। শাসনকার্যের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ১২ জন সদস্য নিয়ে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হত। মন্ত্রিপরিষদে একজন প্রধান মন্ত্রী, পাঁচজন মন্ত্রী এবং ছ'জন সাহায্যকারী থাকত। শাসনতন্ত্রের প্রতিটি বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার জন্য একটি বোর্ড গঠন করা হত। শাসনকার্য ব্যতীত বড় বড় সামন্তদের কার্যকলাপের উপরও লক্ষ্য রাখা ছিল এই বোর্ডের আর একটি প্রধান দায়িত্ব। কারণ, এই সব বড় বড় সামন্তদের অনেকেই একমাত্র জাপানের সম্রাটের প্রতিই আনুগত্য স্বীকার করত এবং সগুনদের বিরোধিতা করার সুযোগ খুঁজে বেড়াত।

চতুর্থ পাঠ

সামুরাই

প্রত্যেক সামন্তের অধীনে প্রচুর সামুরাই বা যোদ্ধাশ্রেণীর লোক থাকত। জাপানের সমস্ত প্রথার মূল কথাই ছিল—প্রত্যেক

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই ছিলেন যোদ্ধা আর প্রত্যেক যোদ্ধাই ছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার দিকে তাদের যত আগ্রহ ছিল, লেখাপড়া শেখার দিকে তাদের তত আগ্রহ ছিল না। সামুরাইরা অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তাদের কোনপ্রকার কর দিতে হত না। তাদের জীবনধারণের জন্য ধান প্রভৃতি খাদ্যশস্য ভাতা হিসাবে জমিদারের কাছ থেকে পেত। তবে যুদ্ধ দেখা দিলে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে এবং দেশরক্ষার জন্য প্রাণ দিতে তারা বাধ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে তরবারিই ছিল সামুরাইদের প্রাণ। এমন কি শান্তির সময়েও তারা ইচ্ছামত তরবারি ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করত না। নিম্নশ্রেণীর কোন লোক কোন সামুরাইকে অপমান করলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মেরে ফেলা হত। যুদ্ধব্যতীত জুয়াখেলা এবং ঝগড়াঝাঁটি ও মারামারি করাতেও সামুরাইদের প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। তবে অনেক সময়ই সামুরাইদের ঝগড়াঝাঁটির শেষ নিস্পত্তি তরবারিতেই হত।

পঞ্চম পাঠ

জাপানের শিভ্যালরি বা বীরধর্ম বুশিদো

সামুরাইরা যে শুধু যুদ্ধপ্রিয় ছিল তা নয়, তারা মৃত্যুকেও ভয় করত না। বীরের সম্মান সম্পর্কে তারা অত্যন্ত কঠোর নীতি অনুসরণ করত। এই নীতিকে বুশিদো অথবা বীরের ধর্ম বলে। এই নীতির মূল কথা—যুক্তি সহকারে কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে প্রয়োজনের সময় মৃত্যুবরণ করা অথবা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া। সামুরাইরা কোন অপরাধ করলে আইন-অনুযায়ী তাদের বিচার করা হত। সাধারণ আইন অপেক্ষা এই আইন অনেক বেশী কঠোর ছিল। তারা যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য ও লাভ-লোকসানকে ঘৃণার চোখে

দেখত। টাকা ধার দিতে, ধার করতে অথবা টাকা গুণতে তারা অস্বীকার করত। কোন শপথ তারা কখনও লঙ্ঘন করত না। প্রয়োজনের সময় কেউ তাদের কাছে এসে সাহায্য চাইলে তারা তারজন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারত। তারা অত্যন্ত মিতব্যয়ী এবং কঠোরভাবে জীবন কাটাত। সারাদিনে একবারই তারা খাবার খেত এবং যা জুটত তাই খেত। নীরবে তারা দুঃখকষ্ট, যন্ত্রণা, নির্যাতন সহ্য করত। কখনও কোনরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করত না। সামুরাই-দের স্ত্রীদেরও ধৈর্যের সীমা ছিল না। যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যু হলে তারা বিলাপের পরিবর্তে স্বামীর বীরত্বের জন্য আনন্দ প্রকাশ করত।

সামন্ত প্রধানদের প্রতি অনুগত থাকাই ছিল সামুরাইদের সবচেয়ে বড় ধর্ম। সামন্তের মৃত্যুর পর সামুরাইরা পরলোকে গিয়ে সামন্তকে পরিচর্যা করার জন্য নিজেদের পেট কেটে মৃত্যুবরণ করত। বুশিদোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন ছিল হারা-কিরি বা পেট কেটে আত্মহত্যা করা। তবে আত্মসম্মানবোধ এবং সামন্ত-প্রধানের প্রতি আনুগত্যই হারা-কিরির প্রধান দু'টি কারণ।

অনুশীলনী

১। তাং রাজবংশের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। তাং রাজবংশের শাসনকালে চীনদেশের আইন-শৃঙ্খলা, সাহিত্য ও শিক্ষা সম্পর্কে যা জান লিখ।

২। তাং রাজবংশের আমলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতি কিভাবে উন্নতি লাভ করে এবং চীনে কিভাবে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার করে?

৩। হিউএন-সাঙের চীন দেশে প্রত্যাবর্তনের গল্পটি সংক্ষেপে বল।

৪। সুঙ্ রাজবংশের আমলের চীনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। য়ুয়ান রাজবংশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। (ক) কুবলাই খান সম্পর্কে যা জান লিখ। (খ) মার্কোপোলোর কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা কর। (গ) মধ্যযুগে জাপানের সমাজ কিরূপ ছিল? (ঘ) মধ্যযুগে চীনের সঙ্গে জাপানের কি রকম সম্পর্ক ছিল?

৭। কিভাবে জাপানে প্রভাবশালী জমিদার পরিবারের উত্থান হয়? জমিদারদের উত্থানের ফলে জাপানের কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

৮। জাপানে কিভাবে রাজার শক্তিকে খর্ব করা হয়? রাজা কিভাবে আবার ক্ষমতা অধিকার করার চেষ্টা করেন? রাজাদের এই চেষ্টার ফলাফল লেখ।

৯। জাপানের সপ্তম ও সামুরাইদের এবং শিভ্যালরি সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

১০। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) তাং রাজবংশের রাজ্যের ও শাসন প্রণালী সম্বন্ধে কি জান?

(খ) কোন্ দেশের সঙ্গে মধ্যযুগে চীনের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে? কি ভাবে এই বাণিজ্য পরিচালিত হত?

(গ) হিউএন-সাঙ কোন্ পথে ভারতে আসেন? কোন্ পথ দিয়ে তিনি আবার দেশে ফিরে যান?

(ঘ) মার্কোপোলোর দেশে ফিরে যাওয়ার কাহিনীটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ঙ) নেবুনাগা, হিদেয়োসি ও ইয়েয়াসুর উত্থান সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১১। এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) চীনে কোন্ বছরে তাং রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় ও অবসান ঘটে?

(খ) সুঙ্-রাজবংশ কোন্ বছর থেকে কোন্ বছর পর্যন্ত চীনে রাজত্ব করে?

১২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(ক) তাং রাজবংশ চীনে এক—সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

(খ) মার্কোপোলো — ও — ছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগে ভারত : সপ্তম শতাব্দী

প্রথম পাঠ

হূণ আক্রমণ

হূণরা ছিল মধ্য-এশিয়ার এক যাযাবর জাতি। গুপ্তবংশের সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে হূণদের আক্রমণ শুরু হয়। প্রথম কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে হূণদের পরাজিত করে ভারতের সীমানা থেকে তাদের বিতাড়িত করেন। পিতার মৃত্যুর পর স্কন্দগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন। ৪৫৫ থেকে ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এই সময় হূণরা আবার ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। সম্রাট স্কন্দগুপ্তও হূণদের আক্রমণের হাত থেকে তাঁর রাজ্য রক্ষা করার জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল বিশেষভাবে সুরক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হূণরা গান্ধার জয় করে। ৪৫৮ থেকে ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হূণ জাতি পারস্য ও কাবুল অধিকার করে এবং ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। হূণরা তখন গান্ধার থেকে বারবার ভারত আক্রমণ করে এবং কিছু-দিনের মধ্যেই পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু ও পূর্ব মালব জয় করে। এই সময় হূণদের নেতা ছিলেন তোরমান। তোরমান মহারাজা-ধিরাজ উপাধি গ্রহণ করে ভারতের হূণদের রাজ্য শাসন করতে শুরু করে। তোরমানের আমলে উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভারতে হূণদের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

তোরমানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মিহিরকুল সিংহাসন অধিকার করে। পাঞ্জাবের সাকল অথবা শিয়ালকোটে তার রাজধানী ছিল। মিহিরকুল অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অত্যাচারী শাসক ছিলেন। তার

অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা মগধের গুপ্তরাজবংশের রাজা বালাদিত্যের নেতৃত্বে হূণদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বালাদিত্য মিহির-কুলকে পরাজিত ও বন্দী করেন; কিন্তু পরে তাকে মুক্তি দেন। যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হওয়া সত্ত্বেও মিহিরকুল প্রজাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করেনি। ৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম মালবের মান্দাসোরের শাসনকর্তা যশোবর্মন আবার মিহিরকুলকে পরাজিত ও বন্দী করেন। কিন্তু তিনিও তাকে মুক্তি দেন। মুক্তি পেয়ে মিহিরকুল কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেন। সম্ভবতঃ ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতে হূণদের রাজত্বের অবসান ঘটে।

হূণ আক্রমণের ফলাফল: হূণদের আক্রমণের ফলে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন দেখা দেয়। হূণ আক্রমণের কালেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। বহু বৈদেশিক জাতিও ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে। তাদের মধ্যে সৌরাষ্ট্রের বল্লভী অঞ্চলের মৈত্রক এবং রাজপুতনার গুর্জরদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হূণ আক্রণের ফলে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের সামাজিক জীবনের পরিবর্তন দেখা দেয়। গুর্জর প্রভৃতি হূণজাতির লোকেরা রাজপুতদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায় এবং হিন্দুসমাজে ক্ষত্রিয়দের ন্যায় মর্যাদা পেতে থাকে। তবে হূণদের আক্রমণের ফলেই হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা আরও কঠোর হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পাঠ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন

সম্রাটদের দুর্বলতা, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ এবং হূণ আক্রমণ ও অন্যান্য কারণে গুপ্ত রাজবংশের পতন ঘটে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ফলে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন রাজ্য গড়ে ওঠে। মগধ ও

তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'পরবর্তী গুপ্ত' নামে পরিচিত রাজবংশ অধিকার স্থাপন করে। মালবও সম্ভবতঃ তাদের অধীনে ছিল। উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা ও আগ্রা অঞ্চলে মৌখরী রাজবংশ রাজত্ব করত। কনৌজ ছিল তাদের রাজধানী। মগধ ও মালবের গুপ্ত রাজাদের সঙ্গে মৌখরী রাজদের সংঘর্ষ প্রায় সব সময়ই লেগে থাকত। মৌখরী রাজগণ বেশ কয়েকবার হূণ আক্রমণও প্রতিরোধ করে।

গুপ্তদের পতনের পর মান্দাসোরের শাসনকর্তা যশোবর্মন হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি হূণরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত করেন। তাঁর যুদ্ধজয়ের কথা স্মরণীয় রাখার জন্য তিনি মান্দাসোরে একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। ঐ স্তম্ভের গায়ে খোদাই করা লিপি থেকে জানা যায় যে তিনি ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত উত্তর-ভারত জয় করেন। কিন্তু তাঁর বংশ পরিচয় বা পরবর্তী ইতিহাস কিছু জানা যায় নি। সম্ভবতঃ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মান্দা-সোরের গৌরবের যুগের অবসান ঘটে। মধ্য-ভারতের বেরার অঞ্চলে বাকাটক রাজবংশও এই সময় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করে।

গুপ্তদের পতনের পর সৌরাষ্ট্রের বল্লভী অঞ্চলে মৈত্রক রাজবংশ তাদের অধিকার স্থাপন করে। রাজপুতানায় গুর্জরদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। পাঞ্জাবে পুষ্যভূতি রাজবংশ রাজত্ব করত। থানেশ্বর ছিল তাদের রাজধানী।

শশাঙ্ক নামে এক ব্যক্তি এই সময় বাঙলাদেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানেও শশাঙ্কের রাজনৈতিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ফলে থানেশ্বর ও কনৌজের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর থানেশ্বর ও বাঙলাদেশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়।

তৃতীয় পাঠ
হর্ষবর্ধন

থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজাদের মধ্যে প্রভাকরবর্ধনই ছিলেন প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। তিনি গুর্জরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করেন। মালব ও গুজরাটে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়। কনৌজের মৌখরীবংশের রাজা গ্রহবর্মনের সঙ্গে নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিয়ে দিয়ে প্রভাকরবর্ধন উভয় রাজ্যের মধ্যে মিত্রতা গড়ে তোলেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন। সেই সময় গৌড় রাজ্য বাঙলাদেশের শাসক ছিলেন শশাঙ্ক। তিনি মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে কনৌজ ও থানেশ্বরের বিরোধিতা শুরু করেন। রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করার পরই মালবের রাজা দেবগুপ্তের হাতে গ্রহবর্মণের পরাজয় ও মৃত্যু এবং রাজ্যশ্রীর বন্দী হওয়া সংবাদ পান। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। দেবগুপ্ত তাঁর কাছে পরাজিত হন। কিন্তু গৌড়রাজ শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধন পরাজিত ও নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সিংহাসন লাভ করেন এবং ৬০৬ থেকে ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি থানেশ্বরে রাজত্ব করেন।

হর্ষবর্ধন

সিংহাসনে আরোহণের সময় হর্ষবর্ধনের বয়স ছিল মাত্র ষোলো বছর। রাজ্যশাসনেও তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সম্ভবতঃ সে কারণেই সিংহাসনে আরোহণের পর ছয় বছর যুবরাজ শিলাদিত্য নামেই পরিচিত ছিলেন। তারপর তাঁর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধন নামে পরিচিত হন।

সিংহাসনে অরোহণের পরই হর্ষবর্ধন গৌড়রাজ শশাঙ্ককে দমন করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের যুদ্ধের ফলাফল সঠিক ভাবে বলা যায় না। এই যুদ্ধের সময়ই তিনি সংবাদ

পান যে রাজশ্রী মুক্তিলাভ করে বিন্ধ্য পর্বতে আশ্রয় নিয়েছেন। হর্ষবর্ধন এ সংবাদ পেয়ে ভগ্নীকে উদ্ধার করতে যান এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগ্নীকে উদ্ধার করেন। ভগ্নীকে উদ্ধারের পর তাঁর অনুরোধে হর্ষবর্ধন কনৌজের শাসন ভারও গ্রহণ করেন।

কনৌজ ও থানেশ্বর যুক্ত হওয়ার পর সম্রাট হর্ষবর্ধন রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তাঁর আমলে উত্তর ভারতে আবার রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। পূর্ব পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, বিহার, বাঙলাদেশ ও গুজরাটের কিছু অংশ তাঁর অধিকারে আসে। আসাম, নেপাল ও সিন্ধুদেশের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন।

উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পর হর্ষবর্ধন ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারত জয়ের সংকল্প করেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে রাজ্য-বিস্তার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে তিনি পরাজিত হন। নর্মদা নদী উভয় রাজ্যের সীমানা বলে নির্ধারিত হয়। তবে ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বল্লভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনকে পরাজিত করেন। আনন্দপুর, কচ্ছ, দক্ষিণ কাথিওয়াবাড়ও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গঞ্জামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধই হর্ষবর্ধনের জীবনের শেষ যুদ্ধ।

গুপ্ত রাজবংশের আমলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে রাজ-নৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠে। কিন্তু গুপ্তদের পতনের পর, এই রাজ-নৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। হর্ষবর্ধন আবার উত্তর ভারতে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন এবং সকলোত্তরপথ নামে পরিচিত হন। কিন্তু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে পরাজিত হওয়ার ফলে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

হর্ষবর্ধন প্রথম জীবনে শিবের উপাসক ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী হন। প্রজাদের কল্যাণই ছিল হর্ষবর্ধনের জীবনের একমাত্র ব্রত। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্যও চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টার ফলেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি জ্ঞানী ও গুণীর

সমাদর করতেন। হর্ষচরিত ও কাদম্বরীর রচয়িতা কবি বাণভট্ট তাঁর সভাকবি ছিলেন। হর্ষবর্ধন নিজেও প্রিয়দর্শিকা, রত্নাবলী ও নাগানন্দ নামে তিনটি নাটক রচনা করেন। চীনা পর্যটক হিউএন-সাঙের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। হিউএন-সাঙের বিবরণ থেকে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের অনেক সংবাদ জানা যায়।

৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। তাঁর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। ফলে তাঁর মৃত্যুর পরই থানেশ্বর রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। হর্ষবর্ধনই হিন্দু যুগে ভারতের শেষ উল্লেখযোগ্য সম্রাট।

চতুর্থ পাঠ

হিউয়েন-সাঙের ভারত ভ্রমণ ও বিবরণ

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাসখন্দ, সমরখন্দ ঘুরে গান্ধার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। ১৩ বছর ভারতে বসবাস করার পর তিনি কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান হয়ে দেশে ফিরে যান। সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজ্যে তিনি ৬৩৫ থেকে ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন। তাঁর ধর্মচিন্তা, দর্শন ও ব্যক্তিত্বে সম্রাটকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি কনৌজ, থানেশ্বর, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘকাল বাস করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তক্ষশীলার বিদ্যাপীঠেও তিনি কিছুদিন বাস করেন। সারনাথ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের তীর্থস্থানগুলোও দর্শন করেন। তিনি উত্তর ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য স্থান পরিদর্শন করে দক্ষিণ ভারতে যান। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যেও অনেক দিন বাস করেছিলেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর শাসন ব্যবস্থারও যথেষ্ট প্রশংসা করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাস-কালে তিনি নানারূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই সব অভিজ্ঞতার কথা তিনি তাঁর ভ্রমণ লিপিতে রেখে যান। হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-লিপি থেকে হর্ষবর্ধনের আমলের ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

হিউয়েন-সাঙের বিবরণ : হর্ষবর্ধনের আমলে উন্নত ধরনের শাসন পদ্ধতি থেকে হিউয়েন-সাঙ খুব মুগ্ধ হন। শাসনের প্রতিটি কাজেই হর্ষবর্ধন ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তিনি প্রায়ই ঘুরে বেড়াতেন। শাসনকার্যে সম্রাটকে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকত। শাসনের সুবিধার জন্য হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য দু'টি প্রদেশ বা ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলো আবার জেলা বা বিষয়, তহশিল বা পাঠক ও গ্রামে বিভক্ত ছিল। সুষ্ঠুভাবে শাসন কার্য চালনার জন্য মহাসামন্ত, মহারাজা, কুমার, অমাত্য, বিষয়পতি প্রভৃতি রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হত। গ্রামের শাসনকর্তাকে গ্রামিক বলা হত। তাকে সাহায্য করার জন্য আরও কয়েকজন কর্মচারী নিযুক্ত করা হত।

প্রজাদের মঙ্গল সাধন করাই ছিল হর্ষবর্ধনের শাসন নীতির মূল লক্ষ্য। প্রজাদের অল্প পরিমাণে কর দিতে হত। ভূমি রাজস্ব ও সুল্কই ছিল রাষ্ট্রের প্রধান আয়। জমিতে উৎপন্ন শস্যের দু'ভাগের এক ভাগ কর হিসাবে আদায় করা হত।

দেশে অপরাধের সংখ্যা খুব কম ছিল। অপরাধীর কঠোর শাস্তি হত। বিশেষ বিশেষ অপরাধে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ, রাজ্য থেকে অপরাধীকে বিতাড়িত এবং জরিমানা আদায় করা হত। আগুন, জল প্রভৃতির দ্বারাও অপরাধীর বিচারের ব্যবস্থা ছিল।

হর্ষ প্রথম জীবনে শিবের উপাসক ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তবে সকল ধর্মের প্রতিই তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি বহুস্থানে স্তূপ বা মঠ তৈরী করেন। তখন থেকে তিনি তাঁর রাজ্যে পশুবধও নিষিদ্ধ করেন। পশুবধের জন্য কখনো কখনো অপরাধীকে প্রাণদণ্ডও দেওয়া হত। প্রজাদের কল্যাণই ছিল হর্ষবর্ধনের জীবনের একমাত্র ব্রত।

হিউয়েন-সাঙের সম্মানে হর্ষবর্ধন কনৌজে এক বৌদ্ধ ধর্মসভার আয়োজন করেন। এই ধর্মসভার আঠার জন রাজা উপস্থিত

ছিলেন। কনৌজের ধর্মসভার পর হর্ষবর্ধন প্রয়াগে গঙ্গা যমুনার সংযোগ স্থলে একটি মেলার ব্যবস্থা করেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই মেলা বসত। হিউয়েন-সাঙ এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু রাজা এই মেলায় যোগ দেন। হিউয়েন-সাঙ সেখানে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মত ব্যাখ্যা করেন। মেলায় সব টাকা পয়সা, ধনরত্ন দান করে সম্রাট হর্ষবর্ধন একটি মাত্র বস্ত্র সম্বল করে রাজধানীতে ফিরে যেতেন। প্রয়াগের এই মেলায় বুদ্ধদেবের উপাসনাই প্রাধান্য পেত। তবে সূর্য ও শিবের পূজাও হত। বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসীরা সেখানে দান গ্রহণ করতেন।

পঞ্চম পাঠ
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান বিহারের পাটনা জেলায় নালন্দা অবস্থিত। প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের (বর্তমান রাজগীর) কাছেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নালন্দা ছিল মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের ও
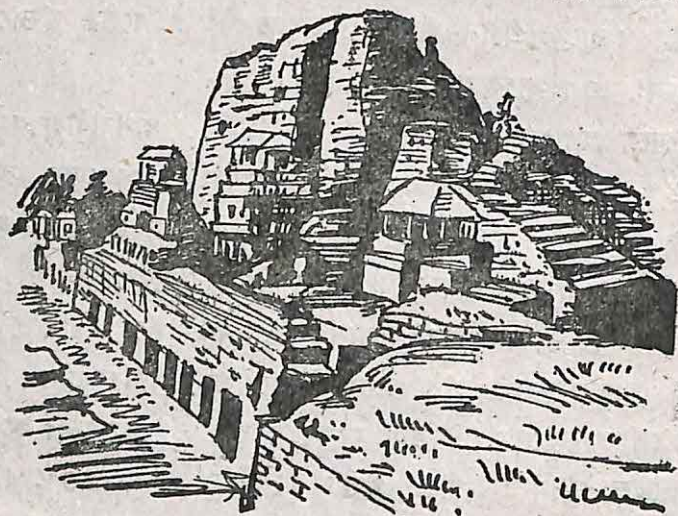
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপ

শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুপ্ত রাজাদের অনেক শীল মোহরও পাওয়া গিয়াছে। সেজন্য অনেকে মনে করেন যে গুপ্ত রাজাদের শাসনকালে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল।

হিউয়েন-সাঙ কয়েক বছর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেন। তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল দশ হাজার। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ধর্ম ছাড়াও রসায়ন, গণিত, আয়ুর্বেদ, ন্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হত। ছাত্রদের কোন বেতন লাগত না। রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত খরচ বহন করত। হিউয়েন-সাঙের সময় শীলভদ্র নামে এক বাঙালী পণ্ডিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। মুসলমানদের ভারত আক্রমণের কালেও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিদেশী আক্রমণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ষষ্ঠ পাঠ

সম্রাট হর্ষবর্ধনের পরবর্তী যুগ : (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)

রাজপুত : হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজ-থানেশ্বর সাম্রাজ্যের পতন হয়। ফলে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ধ্বংস হয় এবং সেখানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে ওঠে। এই সব রাজ্যের অনেকগুলিই ছিল রাজপুতজাতির রাজ্য। সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যু ও দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে মুসলমান অভিযানের মধ্যবর্তীকালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস মোটামুটিভাবে রাজপুত শাসনের ইতিহাস।

রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতরা একমত নন। অনেকের মতে কুষাণ, শক, হূণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির সহিত ভারতীয়দের মিলনের ফলে রাজপুত জাতির উৎপত্তি। রাজপুতদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে এখনও কিছু কিছু বিদেশী রীতি-নীতির প্রচলন আছে। অগ্নি উপাসনা প্রভৃতি কয়েকটি ধর্মীয় নীতি, হূণ বা শকদের মত। তাদের চেহারাতেও বৈদেশিক প্রভাব সুস্পষ্ট। শক্তিশালী গোষ্ঠির প্রধানারাই প্রথমে রাজপুত নামে এবং অন্যান্য সাধারণ

মানুষ জাঠ, গুর্জর, আহির প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। পরে এইসব জাতিগোষ্ঠীর সকলেই রাজপুত নামে পরিচিত হয়। যুদ্ধে পারদর্শিতার জন্যই তারা কিছু সমাজের ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে স্থান পায়। কিন্তু রাজপুতরা নিজেরাই এই মতের বিরোধিতা করে। তাদের মতে তারা সূর্য ও চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয়।

উত্তর ভারতের রাজনীতিতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করলেও রাজপুতরা কখনও কোন বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে নি। উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলে বিভিন্ন রাজপুত গোষ্ঠীর নেতৃত্বে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য গড়ে ওঠে। তাই রাজপুত জাতির ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর চৌহান, কনৌজের প্রতিহার, মালোয়ারের পারমার, বুন্দেলখণ্ডের চান্দেলা, মেবারের শিশোদিয়ো, চেদির কলচুরি ও জয়পুর বা অম্বরের রাজবংশের ইতিহাস। এইসব রাজবংশের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য ছিল না। এই বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ লেগে থাকত। দেশের স্বার্থ অপেক্ষা গোষ্ঠীর স্বার্থকেই তারা বড় বলে মনে করত। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য তারা একযোগে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। মুসলমানদের আক্রমণের সময় রাজপুতদের এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। আত্মকলহের ফলেই দিল্লীর চৌহান ও কনৌজের গহরবাল রাজবংশের পতন হয়।

সপ্তম পাঠ

পাল-প্রতিহার : রাষ্ট্রকূট সংঘর্ষ

রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে প্রায় একশ' বছর ধরে ভীষণ অরাজকতা চলে। শক্তিমানদের অত্যাচারে দুর্বলদের জীবন অসহ্য হয়ে উঠে। নানা বিদেশীজাতিও এইসময় বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। এই অনিশ্চিত ও অরাজকতা অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ গোপাল নামে এক প্রভাবশালী সামন্তকে বঙ্গদেশের রাজা নির্বাচিত করেন। সম্ভবতঃ ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে

গোপাল বঙ্গদেশের রাজা হন। রাজ্যে শান্তি স্থাপন করে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন।

গোপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল বঙ্গদেশের ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্মপাল পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁর আমলেই বিহারে পালদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের উপর তিনি আধিপত্য বিস্তার করতে চেষ্টা করেন। ফলে মালবের প্রতিহার রাজবংশ ও দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশের সঙ্গে পাল রাজবংশের সংঘর্ষ শুরু হয়।

মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাসে কনৌজ সবচেয়ে রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে। পাল, প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট তিন রাজবংশের রাজারাই কনৌজ অধিকার করে উত্তর ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা শুরু করে। মগধ বা বিহার অধিকার করার পর রাজা ধর্মপালের রাজ্য পশ্চিমে এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এবার তিনি কনৌজ অধিকার করতে প্রস্তুত হন। অপরদিকে মালবের প্রতিহার রাজ বৎসরাজও কনৌজ অধিকার করতে চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবও উত্তরদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করে কনৌজ অধিকার করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তিন রাজবংশের সংঘর্ষের প্রথমদিকে গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলে ধর্মপালের সঙ্গে বৎসরাজের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বৎসরাজ ধ্রুবের নিকট পরাজিত হয়ে রাজপুতানার মরু অঞ্চলে আশ্রয় নেন। ধ্রুব তখন ধর্মপালকে আক্রমণ করেন ও পরাজিত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধের পরই ধ্রুব দক্ষিণ ভারতে ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং সেই সুযোগে ধর্মপাল আবার উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। ধর্মপাল কনৌজের রাজা ইন্দ্ররাজকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে তাঁর অনুগত চক্রায়ুধকে কনৌজের রাজা বলে ঘোষণা করেন। চক্রায়ুধের অভিষেকের সময় ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার ও কিরা রাজ্যের রাজারা উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এইসব রাজারা ধর্মপালের প্রতি আনুগত্যও স্বীকার করত। এই

সময়ই উত্তর ভারতে পাল রাজবংশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সবচেয়ে বেশি বিস্তৃতি লাভ করে।

উত্তর ভারতে ধর্মপালের এই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট সিন্ধু, বিদর্ভ, কলিঙ্গ, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ফলে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের কনৌজ অধিকার নিয়ে দ্বিতীয় বার সংঘর্ষ শুরু হয়। দ্বিতীয় নাগভট্ট ধর্মপালের অনুগত চক্রায়ুধকে পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করেন। তারপর তিনি ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। মুঙ্গেরের কাছে ধর্মপাল দ্বিতীয় নাগভট্টের হাতে পরাজিত হন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রকুট-রাজ দ্বিতীয় গোবিন্দ সসৈন্যে উত্তর ভারতে এসে উপস্থিত হন। ধর্মপাল তৃতীয় গোবিন্দের আনুগত্য স্বীকার করলে তিনি দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করে ধর্মপালকে বিপদ মুক্ত করেন। যুদ্ধে জয়-লাভের অল্পদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় গোবিন্দ দক্ষিণ ভারতে গেলে ধর্মপাল আবার তাঁর ক্ষমতা বিস্তার করার সুযোগ পান। কিন্তু এই দীর্ঘ সংগ্রামের ফলেও পাল, প্রতিহার বা রাষ্ট্রকুটদের পক্ষে উত্তর ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

অষ্টম পাঠ

উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্য

সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে মালব ও বঙ্গদেশ রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করে। তবে এই দু'টি রাজ্য ছাড়ার উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট অনেক রাজ্য গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে গুর্জর, ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার, ফির, আজমীর, দিল্লী, বুন্দেলখণ্ড, কলিঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের নাম উল্লেখ করা যায়। রাজনৈতিক সুবিধা অনুযায়ী এই সব রাজ্য শক্তিশালী রাজাদের আনুগত্য স্বীকার করত। সাধারণতঃ উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো পাল রাজবংশের এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলো প্রতিহারদের প্রতি অনুগত ছিল।

নবম পাঠ

বঙ্গদেশ

শশাঙ্ক ঃ শশাঙ্কই গৌড়রাজ্যের বা বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা। তবে তাঁর বংশ পরিচয় বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। অনেকে মনে করেন যে শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত এবং তিনি গুপ্ত রাজবংশেই জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি প্রথম জীবনে গুপ্তদের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন।

পরবর্তী গুপ্ত রাজবংশের পতনের পর আনুমানিক ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই শশাঙ্ক বঙ্গদেশে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ছ' মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙ্গামাটি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) ও কঙ্গোদ (দক্ষিণ উড়িষ্যা) জয় করেন। সম্ভবতঃ তিনি পূর্ব বাঙলাও জয় করেন। পশ্চিমে মগধ রাজ্যেও শশাঙ্কের অধিকার স্থাপিত হয়। শশাঙ্কের পূর্বে আর কোন বাঙালী এত বড় রাজ্য গড়ে তুলতে পারে নি। পরবর্তী কালে তিনি বারাণসী জয় করে গৌড়ের চিরশত্রু মৌখরীদের দমন করার জন্য প্রস্তুত হন।

কনৌজের মৌখরীরাজ, গ্রহবর্মন ছিলেন থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের জামাতা। শশাঙ্ক জানতেন যে কনৌজ আক্রমণ করলেই তাঁর থানেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং তিনি মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মৌখরীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই সময় থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হয় এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসার পরেই তিনি সংবাদ পান যে দেবগুপ্তের হাতে মৌখরীরাজ গ্রহবর্মন পরাজিত ও নিহত এবং রাণী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। রাজ্যবর্ধন সঙ্গে সঙ্গে দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। দেবগুপ্ত রাজ্যবর্ধনের হাতে পরাজিত হন। কিন্তু রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসন লাভ করেন। সিংহাসনে বসার পরই তিনি

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। কিন্তু সম্ভবত তিনি শশাঙ্ককে যুদ্ধে পরাজিত করতে ব্যর্থ হন। কারণ ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি স্বাধীনভাবে গৌড়রাজ্য শাসন করেন।

শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে শশাঙ্কের অত্যাচারে অনেক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে সব কাহিনী বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকেই জানা যায় যে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ও তাঁর রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধধর্ম তখনও প্রচলিত ছিল। শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের শত্রু হলে তা কখনও সম্ভব হত না।

দশম পাঠ

পাল ও সেন রাজাদের আমলে বঙ্গদেশের সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা

বাঙলাদেশের জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশের রাজাদের মধ্যে ধর্মপাল, দেবপাল ও দ্বিতীয় মহীপালের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা যায়। পালদের পতনের পর সেন বংশের উত্থান ঘটে। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণ সেন এই বংশের দু'জন প্রধান শাসক।

প্রায় চারশ' বছর ধরে পালরাজবংশ বাঙলাদেশে রাজত্ব করে। পাল রাজবংশের আমলেই বঙ্গদেশে দীর্ঘদিনের জন্য রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠে। দেশে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গড়ে ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উন্নতি দেখা দেয়। সেন রাজবংশের আমলেও এই উন্নতি অব্যাহত থাকে। পালযুগে বঙ্গদেশের লোকদের সামাজিক আচার ব্যবহার ও রীতি-নীতি প্রায় আধুনিক বাঙালীদের মতই ছিল। সে যুগের বাঙালীরা ভাত, ডাল, তরি-তরকারি, মাছ, মাংস, দুধ, ঘি, ছানা, দুগ্ধ জাতীয় নানারকম খাদ্য, পিঠে-পায়েস প্রভৃতি খেতে ভালবাসত। আধুনিক যুগের বাঙ্গালীদের মতই তারা কার্পাস তূলা ও রেশমের তৈরী পোশাক ব্যবহার করত। সাধারণ মানুষের জীবন বেশ

সুখে শান্তিতে কাটত। সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকলেও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ছিল না। সম্ভবতঃ যোগ্যতাই ছিল সরকারী চাকুরীর মাপ কাঠি। পালদের সময় কৈবর্তদের জাগরণ থেকে সে ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সেন রাজগণ বাঙলাদেশের সমাজের কিছু কিছু সংস্কারও করেন। এই সব সংস্কারের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। হিন্দু সমাজকে নতুনভাবে গঠন করার জন্য বল্লালসেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ—এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে কুলীনশ্রেণীর লোকদের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম মেনে চলতে হত। আচার-ব্যবহার, পাণ্ডিত্য, চরিত্রের পবিত্রতা প্রভৃতি নানা-প্রকার গুণের বিকাশই ছিল এই সকল প্রথার মূল উদ্দেশ্য।

ধর্ম ঃ পাল রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং এই সময় একমাত্র বাঙলাদেশেই বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু অন্য ধর্মসম্পর্কেও তাঁরা উদার মনোভাব পোষণ করতেন। তবে এই যুগে বৌদ্ধধর্মের অনেক পরিবর্তন হয় এবং বৌদ্ধধর্মের মহাযানের পরিবর্তে সহজযান বা সহজিয়া মতবাদ প্রসার লাভ করে। সহজিয়া মতবাদের উপর এই সময় অনেক বই লেখা হয় এবং তাদের অধিকাংশ লেখকই বাঙালী। পালদের আমলেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে যান।

সেন রাজগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। তাঁরা তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য মগধ, চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িষ্যা ও নেপালে ধর্মপ্রচারক পাঠান। ধর্মের জন্য তাঁরা সামাজিক সংস্কারও সাধন করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানে যে শিথিলতা দেখা দেয়, সে-সব দূর করার জন্য তাঁরা চেষ্টা করেন। তবে অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে তাঁর সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন।

শিক্ষা ঃ পাল ও সেনরাজগণ শিক্ষানুরাগী ছিলেন। শিক্ষা

বিস্তারের জন্য তাঁরা নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পালদের আমলেই বিক্রমশীলা বিহার ও ওদন্তপুরী বিহার স্থাপিত হয়। পালবংশের শ্রেষ্ঠরাজা ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিহার স্থাপন করেন। নালন্দার ন্যায় বিক্রমশীলা বিহারও ভারতে এবং ভারতের বাইরে প্রসিদ্ধি লাভ করে। গঙ্গাতীরে এক পাহাড়ের উপর এই বিহারে একটি মন্দির ও তার চারদিকে ১০৭টি ছোট ছোট মন্দির ছিল। ৯১৪ জন শিক্ষক সেখানে নানা বিষয়ে অধ্যাপকা করতেন। তিব্বত থেকে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে শিক্ষালাভ করতে আসতেন। বিক্রমশীলা বিহারের আচার্য বা ব্রহ্মাচার্য ছিলেন ভিক্ষু জ্ঞানপাদ। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ), কমলশীল, প্রভাকর, কল্যাণ রক্ষিত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এখানে অধ্যাপনা করতেন। শিক্ষালাভ করার জন্য ছাত্রদের কোন অর্থব্যয় করতে হতো না।

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ওদন্তপুরী বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। প্রসিদ্ধ বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ওদন্তপুরী বিহারে শিক্ষালাভ করেন। এখানে মেধাবী ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হত। ওদন্তপুরী বিহার পালযুগের স্থাপত্য শিল্পেরও এক অপূর্ব নিদর্শন।

সেন রাজবংশের রাজা বল্লালসেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কবি হিসাবেও তিনি খুব সুখ্যাতি অর্জন করেন। 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

একাদশ পাঠ

দক্ষিণ ভারত

চালুক্য রাজবংশ, বাদামীর চালুক্য ও কাঞ্চীর পল্লব রাজবংশ

[ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত]

বর্তমান কর্ণাটক অঞ্চলে বাতাপি বা বাদামীকে কেন্দ্র করে চালুক্য বংশের রাজ্য গড়ে ওঠে। এই রাজবংশ বাদামীর চালুক্য বংশ নামে পরিচিত। চালুক্য বংশের প্রথম রাজা জয়সিংহ বল্লভ। এই

বংশের তৃতীয় রাজা প্রথম পুলকেশী খুব শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি ৫৩৫ থেকে ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এর পুত্র কীর্তিবর্মার সঙ্গে দক্ষিণ কোঙ্কনের মৌর্যদের যুদ্ধ হয়। কীর্তিবর্মার পর সিংহাসনে বসেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মঙ্গলেশ। তিনি ৫৯৮ থেকে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যত্ব করেন। তিনি মহারাষ্ট্র পর্যন্ত চালুক্য আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁকে হত্যা করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর রাজত্বকালে উত্তর গুজরাটের দক্ষিণ অঞ্চল, পশ্চিমে কোঙ্কন এবং দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত চালুক্য রাজ্য বিস্তৃত হয়। থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের দক্ষিণ ভারতের অভিযানও তিনি ব্যর্থ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর এই রাজনৈতিক আধিপত্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহবর্মন দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করেন। চালুক্য রাজ্যের রাজধানী বাদামীও তিনি অধিকার করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীই বাদামীর চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর রাজত্বকালেই চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ চালুক্য রাজ্য ভ্রমণ করেন এবং দ্বিতীয় পুলকেশীর শাসন দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হন। তারপর চালুক্য ও পল্লবদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবদের বিতাড়িত করে বাদামী উদ্ধার করেন। তারপরও চালুক্য ও পল্লবদের বিরোধ চলতে থাকে। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য চালুক্য বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা। তিনি ৭৩৩ থেকে ৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মার রাজত্বকালে ৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ চালুক্য রাজ্য অধিকার করলে বাদামীর চালুক্যদের রাজত্বের অবসান ঘটে।

দ্বাদশ পাঠ

চালুক্যদের শিল্পকলা ও স্থাপত্য

চালুক্য রাজবংশ ব্রাহ্মণ ছিল। তাদের সময়ে অনেক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের মন্দির তৈরি হয়। চালুক্যদের রাজ্যের মধ্যেই অজন্তা

এবং ইলোরা অবস্থিত। অজন্তা এবং ইলোরার অনেক গুহাচিত্রও চালুক্যদের আমলে আঁকা হয়। রাজা মঙ্গলেশ বাদামীর বিখ্যাত শিব মন্দিরটি নির্মাণ করেন। তাদের আমলে পাহাড় কেটে কয়েকটি মন্দির তৈরি হয়। এইসব মন্দিরের মধ্যে যেগুটি শিবের মন্দির সবচেয়ে
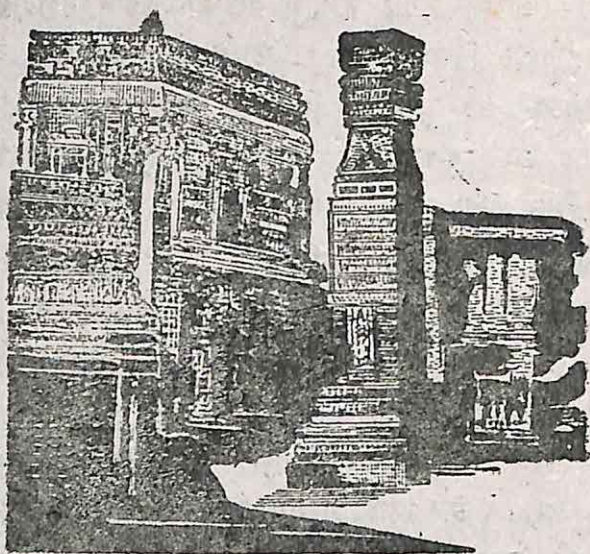
দক্ষিণ ভারতের মন্দির

বিখ্যাত। এই মন্দিরগাত্রে কবি রবিকীর্তির রচিত দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রশস্তি খোদিত আছে। বিজাপুর জেলার বিরূপাক্ষ শিবমন্দির ও আইহোলের বিষ্ণুমন্দির চালুক্যদের ভাস্কর্যের সবচেয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত।

কাঞ্চীর পল্লব রাজবংশ: ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে পল্লব রাজবংশ রাজত্ব করত। বর্তমান তামিলনাড়ু, আর্কট, ত্রিচিনাপল্লী ও তাঞ্জোর পল্লব রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পল্লবদের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত পোষণ করতেন। অনেকের মতে পল্লবরা কোন বিদেশী রাজবংশ। কাঞ্চীর পল্লবদের প্রথম শক্তিশালী রাজা ছিলেন বিষ্ণুগোপ। কিন্তু বিষ্ণুগোপের পর প্রায় আড়াইশ বছরের মধ্যে কোন পল্লব রাজার কথা জানতে পারা যায় না। পরবর্তী পল্লব শাসনের গৌরবময়

ইতিহাসের সূচনা করেন সিংহবিষ্ণু। তিনি ৫৭৫ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি চের, চোল, পাণ্ড্য—এই তিনটি তামিলরাজ্য জয় করেন। তিনি সিংহলেও (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) অভিযান পাঠান। সিংহবিষ্ণুর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র মহেন্দ্রবর্মন। তিনি সম্ভবতঃ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হন। তবে দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী জয় করতে পারেন নি।

মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র নরসিংহবর্মন ছিলেন পল্লব রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি ৬২৫ থেকে ৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করে চালুক্যদের রাজধানী বাদামি অধিকার করেন ও পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন। তাঁর রাজত্বকালে চীনা পর্যটক হিউএন-সাঙ্ কাঞ্চী যান। নরসিংহবর্মনের মৃত্যুর পর পল্লব রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে পল্লব রাজবংশের শেষ রাজা অপরাজিত বর্মনকে পরাজিত ও নিহত করে চোলরাজ আদিত্য পল্লব রাজ্য অধিকার করেন।

পল্লবদের শিল্প ও স্থাপত্য ঃ দক্ষিণ ভারতের রাজবংশগুলোর মধ্যে পল্লবরাই শিল্প ও স্থাপত্যের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্পের কৃতিত্ব পল্লবদের। রাজা মহেন্দ্রবর্মন দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ ভারতের শিল্পরীতিতে তাঁর দান অসামান্য। পাথর কেটে মন্দির নির্মাণের পদ্ধতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত হয়। চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি শিল্পকলাও মহেন্দ্রবর্মনের পৃষ্ঠপোকতা লাভ করে।
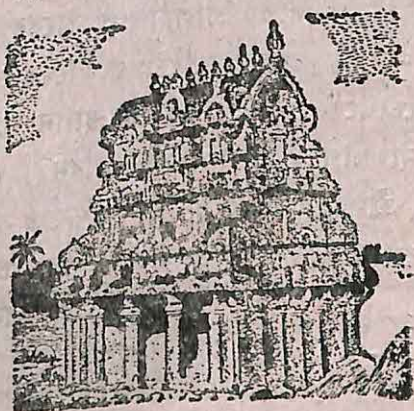
পল্লবদের রথশিল্প

নরসিংহবর্মনও বহু মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি মহাবলীপুরম

নগরীর পত্তন করেন। মহাবলীপুরমের রথশিল্প পল্লবযুগের শিল্পের এক বিশিষ্ট নিদর্শন। কাঞ্চীর কৈলাসনাথের মন্দির ও বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির পল্লব স্থাপত্যের অপূর্ব সৃষ্টি।

পল্লবদের শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত ভাষা সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এই সময় সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থও রচিত হয়। পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। পল্লব-রাজাদের কয়েকজন ছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও সুলেখক।

চোল রাজবংশের সামুদ্রিক অভিযান : দক্ষিণ ভারতে চোল রাজবংশের রাজত্বকালে ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে থাকে। ব্রহ্মদেশ, সিংহল (শ্রীলঙ্কা), ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ এবং মালয় উপদ্বীপের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাবেরী নদীর মোহনায় কাবেরীপত্তনম, ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্দর। এই বন্দরের সাহায্যে বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হত।

সামুদ্রিক বাণিজ্যকে নিরাপদ করার জন্য চোল রাজগণ বিশাল এক নৌবাহিনী তৈরি করতে বাধ্য হন। এই নৌবাহিনীর সাহায্যে বাইরের দেশেও চোলরাজগণ তাঁদের আধিপত্য স্থাপন করেন। চোল নরপতি রাজারাজ চের রাজাদের নৌবাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করে চোলদের নৌশক্তি প্রাধান্য স্থাপন করেন। নৌশক্তির সাহায্যে তিনি মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ জয় করেন। চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র সিংহল (শ্রীলঙ্কা) জয় করেন। নৌশক্তির সাহায্যে তিনি কিছুকালের জন্য সুমাত্রা এবং মালয় উপদ্বীপের উপরও চোলদের আধিপত্য স্থাপনকরেন।

অনুশীলনী

১। হূণদের সম্বন্ধে কি জান? হূণদের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে কি জান?

২। তোরমান ও মিহিরকুলের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। ভারতে হূণ আক্রমণের ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি? গুপ্তদের পতনের পর ভারতের রাজনীতিতে কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

৫। সম্রাট হর্ষবর্ধন সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৬। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনীটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। হিউএন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ ও ভারত সম্পর্কে তাঁর বিবরণটি সংক্ষেপে লিখ।

৮। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কি জান ?

৯। রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান ?

১০। পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট সংঘর্ষের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

১১। রাজা শশাঙ্কের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১২। পাল ও সেনদের আমলে বাঙলাদেশের সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

১৩। চালুক্য রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা কর।

১৪। পল্লব রাজবংশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

(ক) চোল রাজদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কি জান ? (খ) পল্লবদের স্থাপত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে কি জান ? (গ) চালুক্য রাজবংশের আমলের স্থাপত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে কি জান ? (ঘ) নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী বিহার সম্পর্কে কি জান ? (ঙ) সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে যে সব রাজ্য গড়ে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৬। এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) মিহিরকুল কে ছিলেন ? (খ) প্রভাকরবর্ধন কোন্ দেশের রাজা ছিলেন ? (গ) রাজ্যশ্রী কে ? (ঘ) দেবগুপ্ত কোন্ দেশের রাজা ছিলেন ? (ঙ) রাজ্যবর্ধন কে ? (চ) হর্ষবর্ধন কে ছিলেন ?

১৭। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-শিল্পের কৃতিত্ব —। (খ) পল্লবদের রাজধানী — ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। (গ) মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র—পল্লব রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। (ঘ) অজন্তা এবং ইলোরার বহু গুহাচিত্র ও— আমলে আঁকা হয়।

১৮। সঠিক উত্তরটির পাশে ✓ এই চিহ্ন দাও ঃ

(ক) হর্ষবর্ধন ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বল্লভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেন/দ্বিতীয় পুলকেশী/দ্বিতীয় নরসিংহকে পরাজিত করেন। (খ) চীনা পরিব্রাজক হিউএন-সাঙ ৬৩০/৬৩১/৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। (গ) গোপালের মৃত্যুর পর ধর্মপাল ৭৭০/৭৭৩/৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক

প্রথম পাঠ

স্থলপথে মধ্য-এশিয়া ও চীনে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার

কুষাণ রাজবংশের রাজত্বকালে মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কণিষ্কের
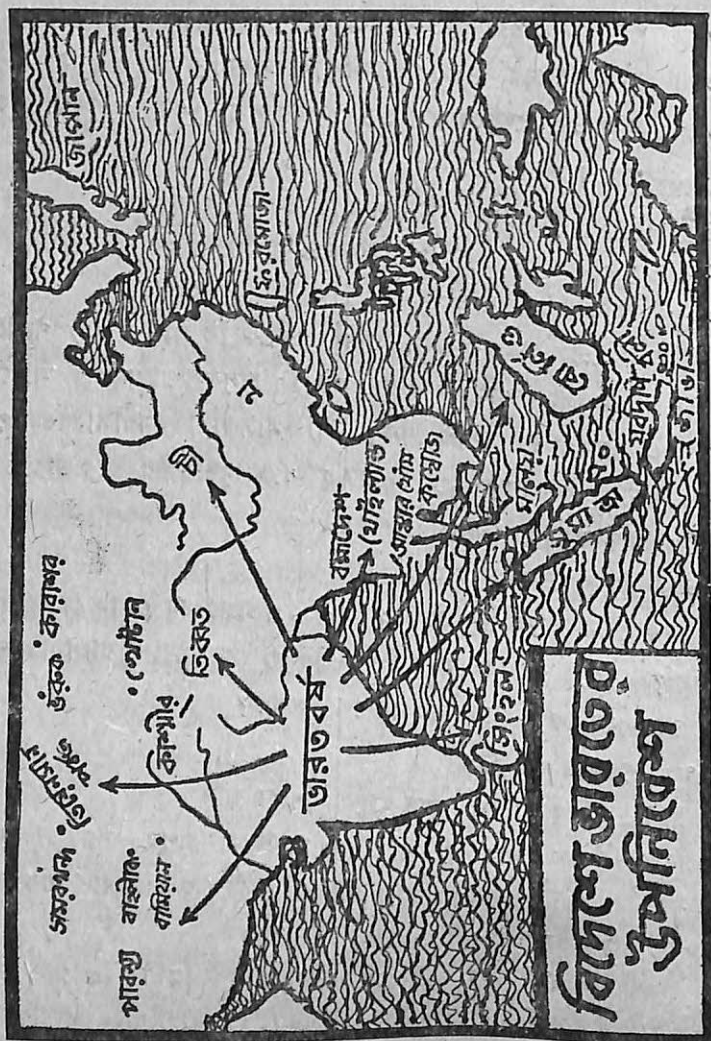
আমলে কুষাণ সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়ার খোটান ও খোরাসান থেকে পূর্বে বিহার ও দক্ষিণে উজ্জয়িনী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সম্রাট

কণিষ্ক নিজেদের মহাযান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং মধ্য-এশিয়ায় এই ধর্মমত প্রচারের জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেন। কুষাণ আমলে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠে এবং সেখানে অনেক ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এইসব উপনিবেশের মধ্যে শৈলদেশ (কাশগড়), শো-খিউ অথবা চোক্কুক (ইয়ারখন্দ), খোতান্ম (খোটান), দোমোকো, লিয়, দণ্ডাল, অয়লিম, এন্দেরে, কুচি (বর্তমান কুচ), ইয়েন-চি অথবা ইয়েন কি (বর্তমান কারা শহর), তুরফান প্রভৃতি উপনিবেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এইসব স্থানে মহাযান বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। ভারতীয় শিল্পের আদর্শে নির্মিত বহু স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ এইসব অঞ্চলে এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

মধ্য এশিয়ার পথেই ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের আদান-প্রদান শুরু হয়। মধ্য-এশিয়ার পথেই বৌদ্ধধর্মও চীনে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে। হান রাজবংশের সম্রাট মিংতির আমন্ত্রণে মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্মরত্ন ও কাশ্যপ মাতঙ্গ ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য চীনে যান। তিনি প্রায় ৭০ বছর ধরে চীনদেশের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর ধর্ম প্রচারের ফলেই বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। চীনদেশের বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন তীর্থস্থান দেখার জন্য ভারতে আসেন। বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ করার জন্য চীনদেশের অনেকে নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ভারতের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও এই যুগে চীনে বেড়াতে যান। তাঁদের মধ্যে কুমারজীবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনদেশে গমন করেন এবং চীনদেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ৩৫৭ থেকে ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে চীনদেশে বেশ কয়েকবার রাষ্ট্রদূত ও ধর্মপ্রচারক পাঠান হয়। তবে ভারতের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক অপেক্ষা বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় সম্পর্কই ছিল অনেক বেশী গভীর।

চীনদেশের বৌদ্ধভিক্ষু হিউএন-সাঙের বিবরণ থেকে সে-যুগের খোটান শহরের কথা জানতে পারা যায়। হিউএন-সাঙ মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতে প্রবেশ করেন। দেশে ফিরে যাবার সময় তিনি খোটান শহরটি পরিদর্শন করেন। ভারতের কুষাণ রাজাদের আমলে চীনা-তুর্কীস্থানে খোটান রাজ্যটি স্থাপিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই খোটান বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হয়। খোটানে বহু বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপ নির্মিত হয়। তবে খোটানের স্থাপত্যে ভারতের শিল্পকলার উপর গ্রীস, চীন ও পারস্যের শিল্পরীতি গভীর প্রভাব বিস্তার করে। হিউএন-সাঙ খোটানে ভারতীয় অধিবাসীদের বহু উপনিবেশ দেখতে পান। ভারতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও খোটানে বাস করতেন। পরবর্তীকালে কোন প্রাকৃতিক কারণে খোটান শহরটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং মধ্য-এশিয়ার মরুভূমির বালুকারাশি তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে। ঐতিহাসিক অ্যারিস্টটলের চেষ্টায় খোটান অঞ্চল খনন করে প্রাচীন খোটান শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা হয়। এই ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাচীন খোটানের শিল্প, ভাষা, ধর্ম ও স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে হিউএন-সাঙের বর্ণনারও যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পাঠ

তিব্বত

সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়। ভারত ও চীন এই দুই দেশের সঙ্গে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিব্বতের সবচাইতে শক্তিশালী রাজা ছিলেন স্রং-শান-গাম-পো। তিনি লাসা শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিব্বতের নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিব্বতের সিংহাসনে বসেন। তিনি নেপাল ও ত্রিহুত জয় করে রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন। চীনদেশের রাজা নেপালের রাজকন্যাকে বিয়ে করে তাঁর ক্ষমতা বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। স্রং-শাম-গাম-পোর চেষ্টায়ই

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। তিব্বতের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি খোটানের বর্ণমালা গ্রহণ করেন এবং পণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁর রাজসভায় আমন্ত্রণ জানান। ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্রং-শান-গ্রাম-পোর মৃত্যু হয়। একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে মগধ থেকে বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তিব্বতে যান। এই সব সন্ন্যাসীদের চেষ্টায় তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের অনেক সংস্কার সাধন করা হয়।

অতীশ দীপঙ্কর ঃ তিব্বতের রাজা জ্ঞানপ্রভর আমন্ত্রণে যে সকল বাঙালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তিব্বতে যান, তাঁদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। বাঙলাদেশের বিক্রম মণিপুরে গৌড়ের রাজবংশে তাঁর জন্ম হয়। ১৯ বছর বয়সে তিনি ওদন্তপুরী বিহারের আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা নেন। তারপর তিনি সুবর্ণ দ্বীপের প্রধান ধর্মাচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট বার বছর বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি বিক্রমশীলা বিহারের প্রধান আচার্যের পদ লাভ করেন। তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিব্বতে যান। তিব্বতের নানা জায়গায় তিনি ভ্রমণ করেন। প্রায় তের বছর তিনি তিব্বতে বাস করেন এবং কমপক্ষে দু'শত গ্রন্থ রচনা করেন। ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বছর বয়সে তিব্বতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিব্বতের লোকেরা এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করে।

তৃতীয় পাঠ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সমুদ্রপথে ভারতের সম্পর্ক

ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের পূর্ব উপকূলের রাজ্যগুলোর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু ধীরে ধীরে ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও এই সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার উপলক্ষ্যে বহু ভারতীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বসবাস করার জন্য স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে কোনও কোন অঞ্চলে স্থানীয় শাসকদের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে ভারতের লোকেরা রাজ্য গড়ে তোলার

সুযোগ লাভ করে। মালয়, কাম্বোডিয়া, আনাম, যবদ্বীপ বা যাভা, বালি ও বোর্ণিও অঞ্চলে এভাবেই ভারতের রাজ্য গড়ে ওঠে। তবে এই সব রাজ্যের মধ্যে সুবর্ণ দ্বীপ, চম্পা, কম্বোজ এবং সুবর্ণভূমি বা ব্রহ্মদেশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথম দিকে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। এইসব অঞ্চলের অধিবাসীরাও হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতাকে অতি সহজেই গ্রহণ করে। হিন্দুধর্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্মও স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট সমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ব্রহ্মদেশ বা সুবর্ণভূমি ঃ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু ভাষা-ভাষী লোকেরাই প্রথমে ব্রহ্মদেশে উপনিবেশ গড়ে তোলে। বৌদ্ধ-ধর্মের হীনযান মতে বিশ্বাসী এইসব ভারতীয়গণ মনস্ নামে পরিচিত ছিল। মনস্‌দের উপনিবেশের উত্তর দিকে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী প্রোম অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে একটি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্যটির নাম ছিল শ্রীক্ষেত্র। ক্রমে ক্রমে শ্রীক্ষেত্র রাজ্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ব্রহ্মদেশের এক বিরাট অংশ অধিকার করে। কিন্তু বিদেশী শত্রুর আক্রমণে নবম শতাব্দীতে শ্রীক্ষেত্র রাজ্য ধ্বংস হয়।

শ্রীক্ষেত্র রাজ্যের পতনের পর ম্রাম্মা নামে পরিচিত দ্রাবিড় জাতির লোকেরা ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। অল্পদিনের মধ্যেই তারা হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। ব্রহ্মদেশ জয় করে দ্রাবিড় জাতি একটি নতুন রাজ্য গঠন করে; মর্দনপুর ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। সাম্রাজ্যের সবচাইতে বিখ্যাত রাজা ছিলেন অনিরুদ্ধ। ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সমগ্র ব্রহ্মদেশ জয় করেন। তাঁর রাজত্বকালেই ব্রহ্মদেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম বিকাশ ঘটে। ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান।

রাজা অনিরুদ্ধের মৃত্যুর পর ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজ সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে ভারত থেকে অনেক বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ব্রহ্মদেশে যান এবং সেখানে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজের আমলেই ব্রহ্মদেশের স্থাপত্যের

সবচেয়ে সুন্দর নিদর্শন আনন্দ মন্দিরটি নির্মিত হয়। তিনি শিউজিগন প্যাগোডা তৈরির কাজ শেষ করেন এবং বুদ্ধগয়ার মন্দিরটিরও সংস্কার সাধন করেন। ১১২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ত্রিভুবনাদিত্য ধর্মরাজের মৃত্যুর পরই ব্রহ্মদেশের হিন্দু রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের শেষ রাজা নরসিংহ-পতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাজবংশের পতন হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—অর্থাৎ মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলে বহু ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ভারতের উপনিবেশগুলো ধীরে ধীরে কয়েকটি বিশাল রাজ্যে পরিণত হয়। কোন কোন রাজ্য প্রায় দেড় হাজার বছর পর্যন্ত নিজেদের অধিকার বজায় রাখে।

ইন্দোচীনের (বর্তমান ভিয়েতনাম) আনাম নামে একটি প্রদেশে হিন্দুরাজ্য গড়ে উঠেছিল। চম্পা ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। শ্রীমার ছিলেন চম্পার প্রথম হিন্দু রাজা। চম্পা রাজ্যের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জয়পরমেশ্বরবর্মন, হরিবর্মন, জয়ইন্দ্র-বর্মন এবং জয়সিংহবর্মন।

বর্তমান কাম্বোডিয়া, কোচিন চীন, শ্যাম এবং ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ নিয়ে কম্বোজ রাজ্য গঠিত হয়। কম্বোজের রাজগণের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম জয়বর্মন ও দ্বিতীয় সূর্যবর্মন খুবই বিখ্যাত। নয়শ' বছর রাজত্ব করার পর কম্বোজ রাজ্যের পতন হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলোর মধ্যে চম্পা ও কম্বোজে ভারতের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই রাজ্য দুটিতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ছিল। চীনদেশের একজন ঐতিহাসিকের লেখা থেকে জানা যায় যে, বহু ভারতীয় ব্রাহ্মণ সেখানে বাস করতেন এবং শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনায় দিবারাত্র কাটাতেন। তাঁদের চেষ্টায় এই অঞ্চলে সংস্কৃতলিপিও প্রচলিত হয়। চম্পা ও কম্বোজের হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ভারতীয় ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় এখনও বহন করে।

যশোধরপুর : কম্বোজরাজ দ্বিতীয় জয়বর্মন ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি কম্বোজের অঙ্কোর অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন করেন। এই নূতন রাজধানীর নাম যশোধরপুর বা অঙ্কোর-থোম। অল্পদিনের মধ্যেই যশোধরপুর হিন্দু সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র পরিণত হয়। বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হয়। এইসব মন্দিরগুলোই ছিল শাস্ত্র আলোচনার প্রধান কেন্দ্র।

অঙ্কোরভাট : কম্বোজের অঙ্কোরভাট মন্দিরটি প্রধানতঃ বিষ্ণু উপসনার জন্য তৈরি হয়। তবে শিব, অর্জুন এবং অন্যান্য বহু মূর্তি এই মন্দিরটির গায়ে আঁকা আছে। অঙ্কোরভাটের মন্দিরটি পৃথিবীর মধ্যে আকারে বৃহত্তম এবং সৌন্দর্যে অনুপম। এই মন্দিরের আয়তন, শিল্প-নিপুণতা দর্শকদের নিকট বিস্ময়ের বস্তু।
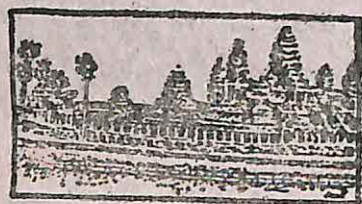
অঙ্কোরভাট

অঙ্কোরথোম : যশোধরপুর বা অঙ্কোরথোম ছিল কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী। অঙ্কোরথোমের ধ্বংসাবশেষ থেকে বোঝা যায় যে, খুব সুন্দর পরিকল্পনা অনুযায়ী এই শহরটি নির্মিত হয়েছিল। বর্গাকৃতি এই শহরটির চারদিকে তিনশ ত্রিশ ফুট চওড়া পরিখা খনন এবং পাথরের প্রাচীর দিয়ে শহরটিকে নিরাপদ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কম্বোজের স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অঙ্কোরথোমের রেয়ন মন্দির। শহরের কেন্দ্রে পিরামিডের আকারে নির্মিত শিবের মন্দিরটিতে চল্লিশটি গম্বুজ আছে। প্রত্যেকটি গম্বুজের চূড়া ধ্যানমগ্ন শিবের আকারে গঠিত। অঙ্কোরথোমের স্থাপত্যে পল্লবযুগের শিল্পের গভীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ পাঠ

মালয় ও যবদ্বীপ

মালয় ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ,

বোর্ণিও প্রভৃতি স্থান নিয়ে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সাম্রাজ্যের অপর নামছিল সুবর্ণদ্বীপ। সুবর্ণদ্বীপ ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব সমৃদ্ধ ছিল। আরব বণিকৃদের সঙ্গে সুবর্ণদ্বীপের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীবিজয় নামে এক ব্যক্তি যবদ্বীপে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করে। তাঁর নাম অনুসারে এই রাজ্যের নাম হয় শ্রীবিজয় রাজ্য। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল তিক্ত-বিল্বনগর। অল্পদিনের মধ্যেই এই রাজ্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং মালবের উপর অধিকার বিস্তার করে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে শ্রীবিজয় রাজবংশে যবদ্বীপ ত্যাগ করে বলিদ্বীপে যায়। পরে সেখানে তারা একটি নতুন রাজ্য স্থাপন করে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র রাজবংশের পতন হয়। শৈলেন্দ্রবংশের রাজারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ। ধর্মের ব্যাপারে তারা ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। বাঙালী বৌদ্ধভিক্ষু কুমার ঘোষ ছিলেন তাদের ধর্মগুরু।

বরবুদর : শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বরবুদরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরটি তাদের আমলে নির্মিত হয়। মন্দিরটির আয়তন চারশত বর্গফুট। মন্দিরের গায়ে অসংখ্য বুদ্ধ-মূর্তি আঁকা আছে। বরবুদর ভারতীয় ও যবদ্বীপের ভাস্কর্যরীতির সংমিশ্রণের এক সুন্দর নিদর্শন।
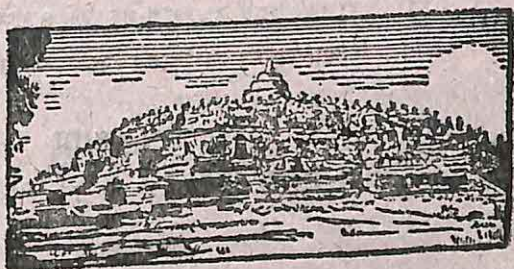
বরবুদর

অনুশীলনী

১। মধ্য-এশিয়া ও চীনদেশে ভারতের বৌদ্ধধর্ম কি ভাবে প্রচারিত হয়?

২। তিব্বতের সঙ্গে কিভাবে ভারতের সম্পর্ক গড়ে ওঠে? অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য কি করেন?

৩। ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কি ভাবে গড়ে ওঠে? ভারতের ব্রহ্মদেশের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে?

৪। মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের কিরূপ সম্পর্ক ছিল?

৫। অঙ্কোরথোম, অঙ্কোরভাট ও বরবুদর সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ

৬। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও:

(ক) কুমারজীব; (খ) স্রং-শান-গাম-পো; (গ) অতীশ দীপঙ্কর; (ঘ) রাজা অনিরুদ্ধ; (ঙ) ত্রিভুবনাদিত্য; (চ) শ্রীবিজয়।

৭। নিম্নলিখিত স্থানগুলো সম্পর্কে যা জান লিখ:

(ক) খোটান; (খ) শ্রীক্ষেত্র; (গ) চম্পা; (ঘ) তিক্ত-বিল্বনগর; (ঙ) যশোধরপুর; (চ) বেয়ন মন্দির।

৮। এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) কম্বোজের স্থাপত্য-শিল্পের প্রধান নিদর্শন কি?

(খ) শৈলেন্দ্র রাজবংশ কোথায় স্থাপিত হয়?

(গ) কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে অঙ্কোরভাটের মন্দির নির্মিত হয়?

৯। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(ক) ভারত ও চীন—এই দুই দেশের সঙ্গে—ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

(খ) —রাজত্বকালেই ব্রহ্মদেশে সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম বিকাশ ঘটে।

(গ) কম্বোজের স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন —।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দিল্লীর সুলতানগণ (১২০৬—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রথম পাঠ

তুর্কী আফগানদের ভারতে আগমন

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধুদেশ ও পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে আরবের মুসলমানদের অধিকার স্থাপিত হয়। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে মুসলমানদের কোনরূপ গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু আফগানিস্তানে মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার পরে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ভারতের উপর মুসলমানদের আক্রমণের আশঙ্কা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। গজনীর মুসলমান

শাসকগণ নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সতরো বার ভারত আক্রমণ করেন। তবে
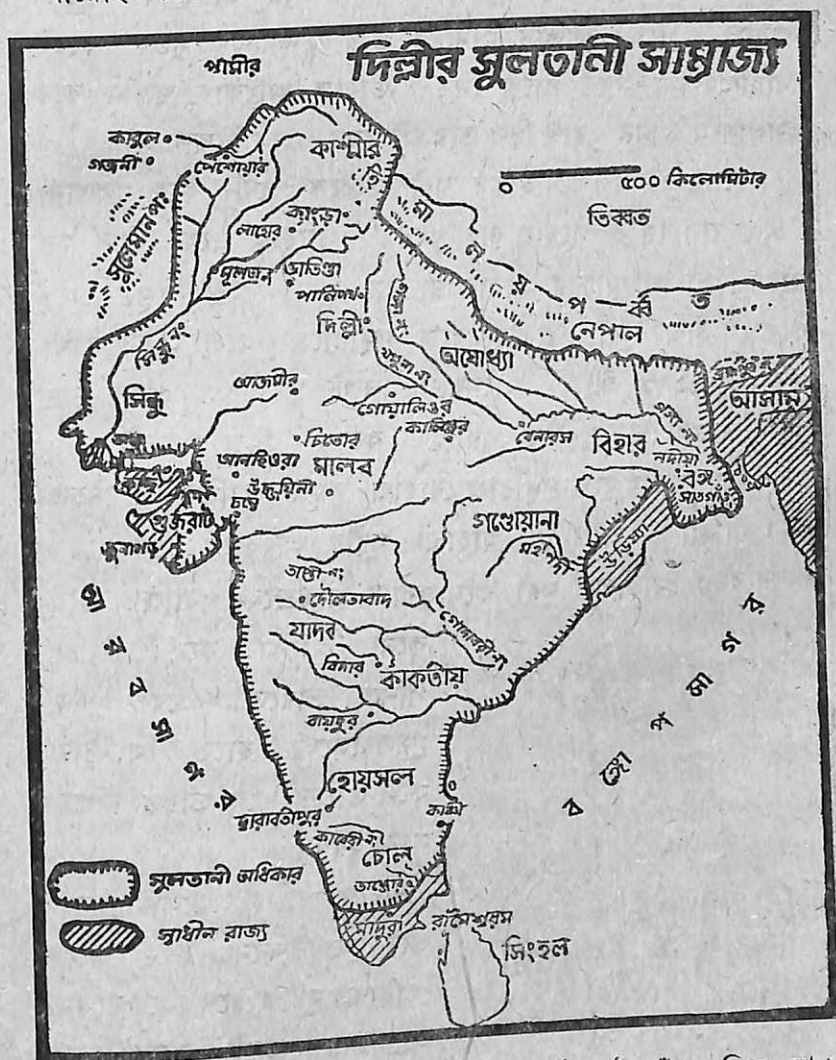
ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। হিন্দুদের মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস এবং ধনরত্ন লুণ্ঠন করাই ছিল মামুদের অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য।

১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর গজনী রাজ্য দুর্বল

হয়ে পড়ে। গজনীর দুর্বলতার সুযোগে পার্শ্ববর্তী ঘুর রাজ্য গজনী অধিকার করে। ঘুর রাজ্যের শাসনকর্তা গিয়াসউদ্দিন ঘুরীর ভ্রাতা মোহাম্মদ ঘুরী স্থলতান মামুদের মত কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তবে স্থলতান মামুদের ন্যায় হিন্দুমন্দির লুণ্ঠন করেই মোহাম্মদ ঘুর সন্তুষ্ট থাকে নি; ভারতে অধিকার স্থাপন করে ইসলামধর্ম প্রচার করাই ছিল তার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরী ভারতে প্রবেশ করে মুলতান, উচ, পেশোয়ার ও লাহোর জয় করে। লাহোর জয়ের ফলে ঘুর রাজ্য দিল্লী-আজমীরের চৌহান রাজ্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে মোহাম্মদ ঘুরী ও চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের নিকট তরাই-এর প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ মোহাম্মদ ঘুরীকে পরাজিত করে। কিন্তু পরবর্তী বছর তরাই-এর দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ মোহাম্মদ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। দিল্লী ও আজমীর মোহাম্মদ ঘুরীর অধিকারে চলে যায়। পরের বছর মোহাম্মদ ঘুরী কনৌজরাজ জয়চন্দ্রকে পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রবেশ পথ মুসলমানদের হাতে যাওয়ার ফলে তাদের পক্ষে ভারত বিজয় সহজ হয়।

আলাউদ্দিন

ভারতে বিজিত অঞ্চলের শাসন-ভার কুতুবউদ্দিনের উপর দিয়ে মোহাম্মদ ঘুরী স্বদেশে ফিরে যান। অল্পদিনের মধ্যেই কুতুবউদ্দিন কালিঞ্জর ও গুজরাটের আলহিন-বারা অধিকার করে। ইখ্‌তার-উদ্‌-দিন মোহাম্মদ নামে মোহাম্মদ ঘুরীর আর একজন সেনাপতি বাঙলাদেশ ও বিহার জয় করে। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে এক গুপ্তঘাতকের হাতে মোহাম্মদ ঘুরী নিহত হন।

Spelling mistake

কুতুবউদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্য ১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই বংশের সুলতানদের মধ্যে ইলতুত্‌মিস, গিয়াস-উদ্‌দিন বলবন, আলা-উদ্‌-দিন খিলজি ও মোহম্মদ বিন-তুঘলকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। আলা উদ্‌-দিনের রাজত্বকালে মুসলমানদের কর্তৃত্ব উত্তর ভারত ব্যতীত দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানেও বিস্তৃত হয়। তুর্কী আফগান বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করে মোগল-বংশের বাবর ভারতের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। পানিপথের যুদ্ধের পরই ভারতে তুর্কী-আফগান যুগের অবসান ঘটে।

মোহাম্মদ-বিন্‌-তুঘলক

তুর্কী-আফগান যুগের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন :

তুর্কী-আফগান যুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থাপনের মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্থাপনের ফলে ভারতের রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ভারতের কোটি কোটি হিন্দু অধিবাসী মুসলমানদের অধীন হয়ে পড়ে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ছোট ছোট হিন্দুরাজ্য কোনমতে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তারা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তুর্কী-আফগান যুগের প্রথম দিকে মুসলমানদের সংখ্যা খুব কম ছিল, কিন্তু পরে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সব হিন্দুরাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

তুর্কী-আফগান শাসনগণ এক নতুন রাজনৈতিক আদর্শও ভারতে স্থাপন করে। সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তুর্কী-আফগান বংশের সুলতানগণ শাসক হিসাবে ছিল স্বৈরাচারী ও সর্বশক্তিমান। দিল্লীর সুলতানের অধীনে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারাও তাদের মতই ক্ষমতা ভোগ করত। তবে শাসনতন্ত্র শক্তিশালী ও স্থায়ী করে তোলার জন্য মুসলমান শাসকরা প্রাচীন ভারতের শাসন-রীতির বহু পরিবর্তন করে।

ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে হিন্দুদের সমাজ-জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। মুসলমানদের পূর্বে গ্রীক, শক, হূণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি ভারতে প্রবেশ করেছিল। তবে তারা অল্পদিনের মধ্যেই ভারতীয় ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতি গ্রহণ করে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু মুসলমানরা একটি বিশিষ্ট ধর্ম ও সভ্যতা নিয়ে ভারতে আসে। সেজন্য তাদের পক্ষে ভারতীয় সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও ধর্মগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। অন্য দিকে হিন্দুসমাজের জাতিভেদ, উচ্চ রাজপদ লাভের আকাঙ্ক্ষা, জিজিয়া কর, তীর্থকর প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বহু হিন্দু ইসলমধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে ভারতীয় সমাজে অনেক নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইসলাম ধর্মের হাত থেকে ভারতীয় সমাজকে রক্ষা করার জন্য হিন্দুধর্মের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার প্রভৃতি আরও কঠোর করে তোলা হয়।

ভারতে মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্থাপনের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। তুর্কী-আফগান যুগেই হিন্দু সামন্তদের পরিবর্তে মুসলমান সামন্তদের উদ্ভব হয়। তখন থেকেই ভূমি ও রাজস্ববিভাগে অনেক পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। হিন্দু রাজাদের পতন ও সামরিক বিভাগে যোগ দেওয়ার সুযোগ কমে যাওয়ার ফলে বহু হিন্দুসৈন্য জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষিকার্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরও হিন্দুদের পরিবর্তে মুসলমানদের কর্তৃত্ব বেড়ে যায়। তুর্কী-আফগান যুগের মধ্য-এশিয়ার

সহিত ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলেও ভারতের সমুদ্রপথের বাণিজ্য কমে যেতে শুরু করে। হিন্দুদের উপর জিজিয়া, তীর্থকর প্রভৃতি কর বসানোর ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। তুর্কী-আফগান যুগে শাসকদের আয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও সাধারণ প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট অবনতি ঘটে।

দ্বিতীয় পাঠ

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার

হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি ধর্মের রীতি-নীতির এবং সমাজের আচার-ব্যবহারের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কিন্তু দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য ক্রমেই দূর হয়ে যায়। একে অন্যকে জানার আগ্রহ প্রকাশ পেতে শুরু করে। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কও হতে থাকে। ফলে হিন্দু-সমাজের বহু আচার-ব্যবহার মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে। হিন্দুরাও আরবী ফার্সী ভাষা শিখে সুলতানদের অধীনে রাজকর্মচারীরূপে নিযুক্ত হতে থাকে। সেজন্য মুসলমান সমাজের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ হিন্দু সমাজে প্রবেশ করে। এই ভাবেই ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হিন্দুদের উপনিষদের এবং মুসলমানদের কোরাণের মূল কথা "ভগবান এক"। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের এইভাবে কাছাকাছি আসার ফলে হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান পীরদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সন্ন্যাসীদের প্রতি ভক্তি বাড়তে শুরু করে।

শিল্প ও সাহিত্য ঃ তুর্কী-আফগান সুলতানদের আমলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সে যুগের সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু-মন্দিরে মুসলমানদের শিল্পরীতির এবং মুসলমানদের মসজিদে হিন্দু-শিল্পকলার প্রভাব অনেক স্থানেই লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই প্রভাব আরও গভীর। সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য

খুব উন্নত হয়। সুলতানদের উৎসাহে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করা হয়। বাঙলাদেশের সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে দিয়ে মহাভারত অনুবাদ করান। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ কবি শ্রীকর নন্দীকে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করতে উৎসাহ দেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণও এই যুগের রচনা বলে অনেকে মনে করে। বাঙলাদেশের সুলতান বারবাদ শাহের আমলে মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ করেন।

ভক্তিবাদ ঃ দিল্লীর সুলতানী আমলে ইসলামধর্মের প্রভাব থেকে হিন্দুধর্ম রক্ষা করার জন্য হিন্দু সমাজে নানা প্রকার গোঁড়ামি দেখা দেয়। ফলে জাতিভেদের কঠোরতা বেড়ে যায়। এদিকে সমাজের উচ্চবর্ণের লোকদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। অন্যদিকে নিম্ন বর্ণের লোকেরা অত্যাচারিত হতে থাকে। এই সব ঘটনার জন্য ধর্ম ও সমাজের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য অগ্রসর হন। তাঁরা ভক্তিবাদ নামে এক উদার ধর্মনীতি প্রচার করতে শুরু করেন। তাঁদের মতে ভক্তি ও প্রেমের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। ভগবানের নিকট উঁচু বা নীচু বলে কোন মানুষ নেই। সকল মানুষই ভগবানের নিকট সমান। এই সব ধর্মপ্রচারকদের সহজ ও সরল উপদেশ হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোকদেরই মুগ্ধ করে। ভক্তিবাদের প্রচারকদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, নানক এবং কবীরই ছিলেন প্রধান।

শ্রীচৈতন্যদেব ঃ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেব বাঙলাদেশের নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যের পূর্বের নাম ছিল বিশ্বম্ভর। আদর করে তাঁকে গৌরাঙ্গ, নিমাই প্রভৃতি নামেও ডাকা হত। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার নাম শচীদেবী। ছেলেবেলায় নিমাই-এর লেখা পড়ার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। অল্প বয়সেই তিনি পণ্ডিত হিসাবে খুব সুনাম অর্জন করেন এবং টোল খুলে অধ্যাপনা করতে শুরু করেন। চব্বিশ বছর বয়সে নিমাই সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরপুরী নামে এক

সন্ন্যাসীর শিষ্য হন। তারপর কয়েক বছর তিনি প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ান এবং তাঁর নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। তখনকার ভারতবর্ষের বহু পণ্ডিত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুকাল তিনি বৃন্দাবনে বাস করেন। তাঁর চেষ্টাতেই বৃন্দাবন বৈষ্ণবদের মহাতীর্থে পরিণত হয়। দক্ষিণ ভারতেও তাঁর ধর্মমত প্রসার লাভ করে। পুরীর প্রতাপরুদ্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পুরীতে বাস করার শেষ বার বছর তিনি শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতেই থাকতেন। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেব পুরীতে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্যদেব মনে করতেন ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়। তাঁর মতে ছোট-বড় সকলেরই ভগবানকে পূজা করার অধিকার আছে। তাঁর নিকট সকল মানুষই সমান। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। হরিদাস নামে এক মুসলমান তাঁর শিষ্য ছিল। আজিও বাঙলা এবং বাঙলার বাইরে শ্রীচৈতন্যদেব মহাপুরুষ বলে পূজিত হন। ভারতবর্ষে তাঁর পূর্বেও বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু তিনি এই ধর্মে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। পূর্ব ভারতের সমাজজীবনেও শ্রীচৈতন্যদেবের নতুন ধর্ম গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর জীবনী ও বাণী নিয়ে বাঙলায় এক মধুর বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে ওঠে।

নানক ঃ মধ্যযুগের ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে নানক একটি চিরস্মরণীয় নাম। লাহোরের নিকট তালবন্দী গ্রামে ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নানক জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। পরে তিনি ধর্মপ্রচারের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর

প্রচারিত ধর্মের নাম শিখধর্ম। তাঁর মতে মানুষে মানুষে যেমন কোন পার্থক্য নেই, তেমনই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেও কোন প্রভেদ নাই। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টাকে তিনি তাঁর জীবনের ব্রত বলে মনে করতেন। তাঁর মতে সকল ধর্মই এক এবং সকলেই একমাত্র ভগবানের উপাসনা করে। মূর্তিপূজাকে তিনি অর্থহীন বলে মনে করতেন। আন্তরিক ভাবে ভগবানের উপাসনা করা এবং চিত্তকে শুদ্ধ রাখা—এই ছিল তাঁর ধর্মের মূল কথা। ধর্মপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য গুরুর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন—একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের যুক্তিহীন কুসংস্কার এবং প্রয়োজনহীন অনুষ্ঠান নানক সমর্থন করতেন না। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে তিনি তাঁর এই ধর্মমত প্রচার করতে শুরু করেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

নানক

১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নানক দেহত্যাগ করেন। নানকের উপদেশসমূহ গ্রন্থসাহেবে সংকলিত আছে। গ্রন্থসাহেব শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

কবীর

কবীর : বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম প্রচারক রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন কবীর। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুকাল সঠিকভাবে জানা যায় না। জীবনের বেশির ভাগই কবীর বারাণসীতে কাটান। ছেলেবেলায় তিনি

লেখাপড়ার বিশেষ কোন সুযোগ পান নি, তাঁতীর কাজ করেই তাঁর জীবন যাপন করতে হত। কিন্তু সংসার অপেক্ষা ধর্মের দিকেই তাঁর বেশি ঝোঁক ছিল। হিন্দুদের ভক্তিবাদ ও মুসলমানদের সুফি মতবাদ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পরবর্তীকালে তিনি রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং হিন্দি ভাষায় তাঁর ধর্ম প্রচার শুরু করেন। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি বা ইসলামধর্মের সংকীর্ণতাকে তিনি পছন্দ করতেন না। গুরু রামানন্দের ন্যায় তিনিও জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকেই সমান চোখে দেখতেন। রাম ও আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়—এই ছিল তাঁর মূল বাণী। অন্তরকে পাপমুক্ত রাখা এবং ভগবানের প্রতি আন্তরিক ভক্তিকে তিনি সকল ধর্মের সার বলে মনে করতেন। তিনি সহজ ও সরলভাবে বিভিন্ন ধর্মের মূল কথাগুলো শিষ্যদের নিকট প্রচার করতেন। কবীর তাঁর ধর্মমত প্রচারের জন্য কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। ছোট ছোট নীতিমূলক কবিতার সাহায্যে তিনি ধর্মমত ব্যাখ্যা করতেন। এইসব কবিতা 'দোঁহা' নামে পরিচিত। দোঁহাগুলোতে উচ্চভাবের দর্শন-তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কবীরের শিষ্যগণ কবীরপন্থী নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে কবীর পরলোক গমন করেন।

তৃতীয় পাঠ

ইলিয়াস ও হুসেনশাহী যুগে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবন

১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী বংশের সুলতানগণ বাংলাদেশ শাসন করে। এই দুই রাজবংশের অনেক সুলতানই খুব দক্ষ এবং বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। এইসব শাসকদের মধ্যে ইলিয়াস শাহ, সিকন্দর শাহ, হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব শাসকদের সুশাসনের ফলে বাঙলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির

ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। সুদক্ষ শাসকদের চেষ্টায় বাঙলাদেশে আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কৃষিকার্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং দেশের সমৃদ্ধি আবার ফিরে আসে।

এই সময় বাঙলাদেশের সমাজ-জীবনেও অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশের সমাজ-জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে। ভক্তিবাদ ও সুফী মতবাদ গড়ে ওঠার ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মজীবনে যে পরিবর্তন আসে, বাঙলাদেশে সমাজ-জীবনেও তা প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী বংশের সুলতানগণের শিল্পের প্রতি খুব অনুরাগ ছিল। এই সময় বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক মন্দির, মস্‌জিদ ও হাসপাতাল তৈরি করা হয়। গৌড়ের দাখিল-দরওয়াজা, ছোট সোনা-মস্‌জিদ, বড় সোনা-মস্‌জিদ, ফিরোজ-মিনার, বার-দুয়ারী এবং আদিনার মস্‌জিদ এই যুগের স্থাপত্যের প্রধান নিদর্শন। হুসেনশাহের বাঙলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচার। হুসেন-শাহের আমলে সাহিত্যও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। শ্রীরূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব' নামে দু'খানা গ্রন্থ রচনা করেন। মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খান প্রভৃতি সে-যুগের সাহিত্য রচয়িতাদের অন্যতম।

অনুশীলনী

১। তুর্কী-আফগানদের ভারতে আগমনের কাহিনীটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। মোহম্মদ ঘুরী কি উদ্দেশ্যে ভারত আক্রমণ করে? কিভাবে তিনি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন? তাঁর মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্যের কি অবস্থা হয়?

৩। তুর্কী-আফগান যুদ্ধের ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন দেখা দেখা দেয় ?

৪। ভক্তিবাদ কি ? কয়েকজন ভক্তিবাদ প্রচারক সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। নানকের জীবনী ও মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। কবীরের জীবনী ও মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৮। বঙ্গদেশের ইলিয়াসশাহী ও হুসেনশাহী রাজবংশ সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৯। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) সুলতান মামুদ কোন্ দেশের সুলতান ছিলেন ? কি উদ্দেশ্যে সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেন ?

(খ) মোহম্মদ ঘুরী কোন্ দেশের লোক ছিলেন ? তার সম্পর্কে কি জান ?

১০। এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ? (খ) নানক যে ধর্মপ্রচার করেন তার নাম কি ? (গ) কবীর কোথায় ধর্মপ্রচার করেন ? (ঘ) নানক কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

১১। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :

(ক) পৃথ্বীরাজ, (খ) জয়চন্দ্র, (গ) শ্রীকর নন্দী, (ঘ) কৃত্তিবাস।

চতুর্দশ অধ্যায়

মধ্যযুগের অবসান (চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী)

কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন : ইউরোপের নবজাগরণের উপর তার প্রভাব

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদের নেতৃত্বে মুসলমানগণ কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ করে। পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের শেষ গ্রীক সম্রাট ষষ্ঠ কনস্ট্যান্টাইন মুসলমানদের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। তিনদিন ধরে বিজয়ী সৈন্যরা কনস্ট্যান্টিনোপলের ধনরত্ন লুটপাট করে এবং বহু লোককে হত্যা করে। তারা বিখ্যাত সেণ্ট

সোফিয়ার গীর্জাকে মসজিদে পরিণত করে। অটোমান সুলতানের নিকট বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সমগ্র ইউরোপে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কনস্ট্যান্টিনোপলে মরুস্থানের জন্য আবার ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ইউরোপ থেকে একদল সৈন্য সেখানে পাঠাবারও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কনস্ট্যান্টিনোপলে সৈন্য পাঠানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

পৃথিবীর ইতিহাসে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলে শুধু পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যেরই অবসান ঘটেনি—এই সময় থেকেই মধ্যযুগেরও অবসান ঘটে। তখন থেকেই আধুনিক যুগ এবং নবজাগরণের সূচনা হয়। তবে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পূর্বেই ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। তারা সবকিছুকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করার চেষ্টা করতে শুরু করে। অজানাকে জানবার আগ্রহ তাদের মধ্যে ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্য পাঠ, জ্ঞানের পরিধিকে যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে তোলা এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে সব কিছুকে বিচার করার জন্য তারা প্রচণ্ড আগ্রহ প্রকাশ করে। মধ্যযুগের শেষের দিকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্মচিন্তা ও মানবতাবাদের ক্ষেত্রে পেত্রার্ক, ইরাসমসে প্রভৃতি পণ্ডিতরা এক বিরাট পরিবর্তন আনেন। অপর দিকে জেনোয়া, ভেনিস, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি স্থানের শাসকদের আগ্রহে বহু শরিফ নতুন নতুন দেশের সন্ধানে অজানা সমুদ্রে পাড়ি জমায়। এই সময় থেকেই তাদের সঙ্গে আটলান্টিক মহাসাগরের অনেক দ্বীপ এবং আফ্রিকার অনেক অঞ্চলের পরিচয় ঘটে। এইসব নাবিকদের প্রচেষ্টার ফলেই ম্যাগেলান, কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা, অ্যামেরিগো ভেসপুচি প্রভৃতি নাবিককে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিতে আগ্রহী করে তোলে। তাদের চেষ্টার ফলে ইউরোপের জনসাধারণের ভৌগোলিক জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং চীন, জাপান, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ভারতের সঙ্গে তারা পরিচিত হয়ে ওঠে।

আধুনিক যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি মধ্যযুগেই দেখা দিতে শুরু করে। ফিলিপ অগাস্টাসের রাজত্বকাল ফ্রান্স পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে একটি জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করার প্রথম সুযোগ পায়। পরে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একশত বছর ধরে যুদ্ধ করে ফ্রান্সের সম্রাট ফ্রান্সের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। বিজয়ী উইলিয়ম এবং দ্বিতীয় হেনরীর কার্যকলাপ ও শাসন সংস্কারের ফলে ইংলণ্ডে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। স্পেন ও পর্তুগালে এই যুগেই জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়। স্পেনের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে এই যুগেই নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করার সুযোগ পায়।

ধর্ম-নিরপেক্ষ গ্রীক-রোমান সাহিত্য, ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি, জাতীয় রাষ্ট্র গঠন প্রভৃতির ফলে ইউরোপের জনসাধারণের মনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। মধ্যযুগের ধর্মীয় অনুশাসন, কুসংস্কার এবং বাধানিষেধ শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই যুগেই স্বাধীনভাবে সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সৃষ্টি করার দিকে প্রচণ্ড ঝোঁক দেখা দেয়। ফলে মধ্যযুগের অনেকে, বিশেষতঃ যাজক শ্রেণীর লোকেরা তাদের এই আগ্রহ দমন করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। ফলে নতুন চিন্তাধারা ও চিরাচরিত চিন্তাধারার মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয়। ইটালির ফ্লোরেন্স শহরে এই সংঘর্ষ ভয়ানক আকার ধারণ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আধুনিক চিন্তাধারাই জয়লাভের সুযোগ পায়। অন্যদিকে চার্চ ও খ্রীষ্টানধর্মের সংস্কারের জন্যও একদল যাজক যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করে।

মধ্যযুগের শেষদিকে উদারপন্থী চিন্তাধারার প্রভাব সাধারণ মানুষের মনেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় ইউরোপে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয় এবং বহু লোক প্লেগে মারা যায়; ফলে ইংলণ্ডে শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। কিন্তু জোর করে কম মজুরীতে কৃষক ও শ্রমিকদের জমিতে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য জমির মালিকরা চেষ্টা করতে থাকে। কৃষক ও শ্রমিকরা এজন্য খুব অসন্তুষ্ট হয় এবং

তীব্রভাবে এই নীতির প্রতিবাদ করতে শুরু করে। মানুষে মানুষে যে কোন পার্থক্য নেই, একথা তারাই প্রথম ইউরোপে প্রচার করে। ওয়াট টাইলার নামে একব্যক্তি শ্রমিকদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে—যদিও ওয়াট টাইলারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তথাপি শ্রমিকদের দাবি সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা ইংরেজ শাসকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সমস্ত ইউরোপ এইভাবে যখন একটা নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তখন হঠাৎ এল কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের খবর। সঙ্গে সঙ্গে বহু গ্রীক পণ্ডিত প্রাণভয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে পালিয়ে এসে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইটালির শহরগুলো সাদরে তাদের অভ্যর্থনা জানায়। এইসব পণ্ডিতরা সঙ্গে করে এনেছিল প্রচুর পরিমাণে গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থ। ইউরোপের লোকেরা গভীর আগ্রহে এই সব গ্রন্থ পড়তে শুরু করে। এই সব গ্রন্থ থেকে তারা একটা নতুন জগতের সন্ধান লাভ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং চিন্তা-জগতে সৃষ্টি হয় এক বিপুল আলোড়ন। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা দেয় বিরাট পরিবর্তন। মানুষ নিজেকে ও তার মনকে নতুন করে আবিষ্কার করার সুযোগ পায়। দেখা দেয় ইউরোপের চিন্তাজগতে নবজাগরণ। দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলোতে বিশেষতঃ ইটালি ও স্পেনে এইসব জাগরণের প্রথম সূচনা হয়। তারপর নবজাগরণের নতুন চিন্তাস্রোত আল্পস পর্বত অতিক্রম করে জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের অবসান ঘটে।

অনুশীলনী

১। কিভাবে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন হয়? কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনে ফলাফল কি হয়?

২। কি ভাবে মধ্যযুগের অবসান ঘটে?

৩। মধ্যযুগের শেষের দিকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও চিন্তার ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

———